প্রদ্যোত গুহ

কলকাতার ভূত

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬২

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ

মুদ্রাকর প্রেস ১০/১সি মারহাট্টা ডিচ লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৩

স্কেচ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

আমি পেশাদার ঐতিহাসিক নই, ইতিহাসের কৌতূহলী ছাত্র মাত্র। কলকাতার ইতিহাস সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা দীর্ঘকালের, আর আমি দেখেছি কোনো একটা বিষয় নিয়ে একটু বিশদভাবে চর্চা করতে গেলে অনেক খুচরো টুকিটাকি জিনিস চোখে পড়ে, সেগুলি ঝোলায় পুরে রাখলে পরে কাজে লাগে। এই রচনাগুলি এই টুকিটাকি পর্যায়ের। এর ঐতিহাসিক মূল্য হয়তো খুব বেশী নেই, তবে বৈঠকি গল্প হিসেবে সম্ভবত কারো কারোর কাছে মুখরোচক হতে পারে। আর সেটুকু হলেই লেখক তাঁর শ্রম সার্থক বলে মনে করবে।

এই রচনাগুলির মধ্যে কিছু যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, নতুন বাংলা, সপ্তাহ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিগত তিন দশকের মধ্যে, কিছু একেবারে হাল আমলের লেখা এবং ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

যাঁরা ধুলো ঝেড়ে এই রচনাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ছোটো করব না।

প্রদ্যোত গুহ

আমার মেয়ে

মহুয়াকে

কলকাতার ভূত

ভূত আছে কি নেই সে তর্ক হয়ত ভবিষ্যতেও চলবে কিন্তু ইতিমধ্যে ভূত যে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের ছোটোবেলায় কলকাতায় ভৌতিককাণ্ড অনেক ঘটত বলে শুনতাম। অপদেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে এমন লোকের দেখাও হামেশাই পাওয়া যেত। তাদের সেই রোমহর্ষক কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের গায়ে কাঁটা দিত। অন্ধকারে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে পারতাম না। এখন অবশ্য দেব-দ্বিজে ভক্তির মতো ভূত প্রেতের ভয়ও কমেছে। কিন্তু সে অন্য কথা।

আমাদের ছেলেবেলায় ভূত কলকাতার শহরে লোকচক্ষুর অগোচরেই শুধু বিরাজ করত তা নয়—কলকাতার বেশ কিছু-সংখ্যক বাড়িও ছিল তাদের দখলে। লোকে সে-সব বাড়ির ধারে-কাছে ঘেঁষত না। দু'-চারজন 'ড্যাম কেয়ার' লোক

যারা সেই সব বাড়িতে ভূতের উপর মামদোবাজী করতে গেছে—তাদের নাজেহাল হবার কাহিনী তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত। এমন কি তাদের কেউ কেউ জানে-মালে ফৌত হয়েছে বলেও শুনেছি।

এখন কলকাতার লোকসংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে। মাথা গোঁজার তাগিদে লোকে যে-যেখানে পেরেছে ঢুকে পড়েছে—বড়লোকের খালি বাড়ির মতো ভূতের বাড়িও রেহাই পায়নি। ভূতের বাড়িগুলি এতদিনে সত্যিই বে-দখল হল। বেচারা উদ্বাস্তু ভূতেরা কোথায় গেছে জানি না। হয়ত শহরেরই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের সে প্রতাপ আর নেই। ভূতের গল্পও এখন বড় শোনা যায় না।

শহর কলকাতায় নানা দেশের নানা মানুষের ভিড়। কলকাতাকে তাই বলা হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক শহর। কলকাতার মনুষ্যলোকের মতো প্রেতলোকও আন্তর্জাতিক। ভূতেরও দেশ-কাল আছে। সাদা-কালো আছে। ভূতেরও ইতিহাস আছে। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক ভূতের গল্প বলব।

লাটের ভূত

আলিপুরের জজ কোর্টের অনতিদূরে হেস্টিংসের প্রাসাদ। বাড়িটিতে এখন নারী শিক্ষা পর্ষদের আপিস হয়েছে। বাড়িটা এককালে ছিল গবর্নর জেনারেলের পল্লীভবন। বাড়িটা নাকি এক সময় ভৌতিক কার্য-কলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আর সে ভূত স্বয়ং হেস্টিংসের।

লাটসাহেবের ভূত। লাটের মতই ছিল তার চলাফেরা। শোনা যায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি নাকি অদৃশ্য জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে রাজকীয় দাপটে রাস্তা কাঁপিয়ে বাড়ির দরজায় এসে নামতেন। তারপর সেই বিশাল প্রাসাদের প্রতিটি ঘরে তন্ন তন্ন করে কি জানি খুঁজে বেড়াতেন। কোনো মহামূল্যবান বস্তু কি তিনি ঐ বাড়িটাতে ফেলে গিয়েছিলেন যার খোঁজে প্রেতলোক থেকে নিত্য তিনি আনাগোনা করতেন?

ইতিহাসের পৃষ্ঠা এই রহস্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করে। ১৭৮৫ সালের ২১শে জুলাই হেস্টিংস তাঁর বন্ধু এবং প্রাক্তন একান্ত-সচিব নেসবিট টমসনকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটার বয়ান নিম্নরূপ:

"বারে বারে আমার দপ্তরের কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার বা লারকিনসের কাছ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনো সংবাদ পেলাম না। এ নিয়ে আমি যে কী উদ্বেগের মধ্যে আছি তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না।"

দপ্তরটি হেস্টিংসের কাছে কিরূপ মূল্যবান ছিল ১৭৮৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর 'কলকাতা গেজেটে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে তা আঁচ করা যাবে। বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম:

"বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় ওয়ারেন হেস্টিংস মহোদয়ের একটি কালো রঙের বাক্স তাঁর এসপ্লানেডের বাস-ভবন থেকে খোয়া গেছে কিংবা হয়ত ভ্রমক্রমে তাঁর অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

বাক্সটির মধ্যে দুটি মিনিয়েচার ছবি এবং কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র ছিল। এতদ্দ্বারা জানান যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন সংবাদ দিতে পারেন যার ফলে বাক্সটি উদ্ধার করা সম্ভব হবে, মিঃ লারকিনস এবং মিঃ টমসন তাঁকে দুহাজার সিক্কা টাকা পুরস্কার দেবেন।"

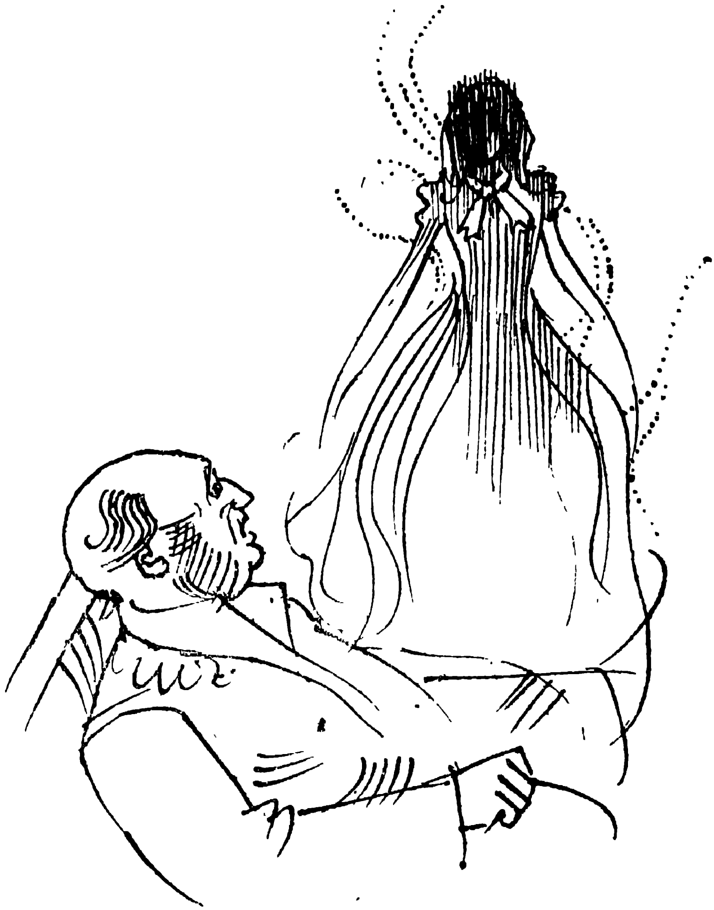
যতদূর জানা যায় দপ্তরটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই দপ্তরটির খোঁজেই কী হেস্টিংস তাঁর প্রাক্তন বাসভবনে হানা দিতেন?

১৮৭৬ সালের প্রথম দিকে বিলেতের ইণ্ডিয়া হাউসের মহাফেজখানায় হেস্টিংসের কিছু কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়। এই কাগজগুলিই কি ছিল সেই রহস্যময় কালো বাক্সে? আর এই আবিষ্কারের পরই কি আলিপুরে হেস্টিংসের ভৌতিক আনাগোনা বন্ধ হয়?

-০- তুমি কি শুধুই ছায়া? -০-

সেকালে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে সার অ্যাণ্টনি ও সার আর্থার বুলার নামে দুজন জজ ছিলেন। সার আর্থার ও তাঁর ভাই চার্লস আবার ছিলেন টমাস কারলাইলের ছাত্র। আমাদের দ্বিতীয় গল্পটি সার অ্যাণ্টনি সম্পর্কে।

সার অ্যাণ্টনির স্ত্রী এবং পরিজনবর্গ ইংলণ্ডে ছিলেন। সার অ্যাণ্টনি একদিন রাত জেগে স্ত্রীর কাছে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখছিলেন। হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখেন তাঁর স্ত্রী দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। জজ সাহেব চমকে ওঠেন। চেয়ার ছেড়ে



উঠে এগিয়ে যান স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর ছায়াশরীর এক-পা দু'পা করে পেছু হটতে হটতে অবশেষে এক সময়ে মিলিয়ে যায়। স্তম্ভিতের মতো জজ সাহেব আবার এসে বসেন চেয়ারে। চিঠির খেই হারিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে। তবু কলম

তুলে নিয়ে আবার চিঠি লেখায় মনঃসংযোগের চেষ্টা করেন। আবার চোখ পড়ে দরজার দিকে। দেখেন, ছায়ামূর্তি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। সার অ্যাণ্টনি আর থাকতে পারেন না। স্ত্রীর নাম ধরে ডেকে দৌড়ে যান ছায়ামূর্তির দিকে। ছায়ামূর্তি আবার পেছু হটতে হটতে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে চাকর-বাকররা এসে দেখে সার অ্যাণ্টনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। পরদিন সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করে এবং স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশে এক চিঠি লেখেন। চিঠিটি পারিবারিক দলিল হিসাবে বুলারদের গৃহে রক্ষিত আছে।

পরের ডাকে জানা যায় সার অ্যাণ্টনি যে সময় ছায়ামূর্তি দেখেছিলেন সেই সময়ই ইংলণ্ডে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

-০- কাউন্সিলে আগন্তুক -০-

সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে অশরীরীর এদেশে আগমনের আর একটি কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় ১৮৮০ সালে প্রকাশিত পাদ্রী সেভিলের একটি বইয়ে। পাদ্রী সাহেব লিখেছেন, "মিঃ স্পার্কস আমাকে জানিয়েছেন তাঁর দাদু যোসেফ কার্টার মহোদয় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সচিব। একদিন সন্ধ্যায় তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলের সভায় বসেছেন কাউন্সিল কক্ষে। মিঃ শেকসপীয়র নামে কাউন্সিলের জনৈক সদস্য হঠাৎ বলে উঠলেন, "হা ভগবান, এ যে দেখছি আমার বাবা!" কাউন্সিলের সদস্যরাও

দেখলেন এক অপরিচিত মূর্তি কাউন্সিল কক্ষের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে আর একটি কক্ষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, যদিও সে কক্ষের কোনো প্রবেশপথ ছিল না। কাউন্সিল সদস্যদের বিশেষ করে যা চোখে পড়ল তা হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের টুপি। এই টুপির নাম ছিল 'চিমনি পট'—এদেশে সে টুপি পাওয়া যেত না।

ঘটনাটি গবর্নর-জেনারেলের মনকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন—ঘটনাটির একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যেন মহাফেজখানায় রাখা হয়। বিবরণটি সম্ভবত এখনও সেখানেই আছে।

কয়েকদিন বাদে মিঃ শেকসপীয়রের বাবার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে একটি জাহাজ এসে কলকাতা বন্দরে ভিড়ল। এই জাহাজেই 'চিমনি পট' টুপির প্রথম চালানও ভারতবর্ষে এসে পৌছল।

-০- বিলেতে ছায়ামূর্তি -০-

অশরীরী ছায়ামূর্তিরা বিলেত থেকে শুধু যে এদেশেই এসেছে তা নয়—এদেশ থেকে ওদেশেও গেছে। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে জেমস ডগলাস এমনি একটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙের জনৈক আত্মীয়া এডিনবরায় থাকতেন। এক সকালে জেগে উঠে তিনি দেখেন তাঁর বাবা তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে। তাঁর পরনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক উর্দি। ভদ্রলোক বুক চেপে ধরলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল বেদনার অভিব্যক্তি। তারপর ছায়ামূর্তি শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা সব কথা জনৈক পাদ্রীকে খুলে বললেন। পাদ্রী সাহেব ঘটনার দিনের তারিখ-টারিখ সব টুকে নিলেন। তখন ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। কাজেই ভদ্রমহিলার দুঃস্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা কেউ খুঁজে পেল না।

পরবর্তী জাহাজে খবর এল ভারতবর্ষে 'মিউটিনির' হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ভদ্রমহিলার বাবা পুরো সামরিক পোশাকে গিয়েছিলেন অধীনস্থ সিপাহিদের শান্ত করতে। সিপাহিদের গুলিতে সেখানে তাঁর প্রাণান্ত হয়।

-○- ধর্মতলার হানাবাড়ি -○-

হাণ্টার অ্যাণ্ড কোম্পানী ছিল সেকালের একটি বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। মিঃ লুইস কুপার ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক। বৌবাজারে এখন যেখানে সেণ্ট জেভিয়ার গীর্জাটি অবস্থিত, ঐখানে একটি বাড়িতে তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতেন। বৌবাজার তখন অভিজাত পাড়া ছিল। দৈব-দুর্বিপাকে ভদ্রলোকের দুটি পুত্রই হঠাৎ মারা যায়। পুত্র বিয়োগের পর ভদ্রলোকের স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে তিনি কিছুদিন ভবানীপুরের উম্মাদ আশ্রমে রাখেন।

এই বাড়ির বেদনাদায়ক স্মৃতি ভদ্রমহিলার মানসিক স্বাস্থ্যের অন্তরায় হবে মনে করে কুপার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অনতিদূরে ধর্মতলার উপর ছোট একটি বাড়ি ভাড়া করে স্ত্রীকে সেখানে এনে রাখেন। নিজে তিনি বৌবাজারের বাড়িতেই রইলেন।

প্রতিদিন সকালে ধর্মতলার সেক্রেড হার্ট গীর্জায় প্রার্থনা সেরে কুপার নিজের বগি গাড়িতে চেপে বাজার নিয়ে যেতেন স্ত্রীর বাসায়।

১৮৪৫ সালের ৬ই মার্চ সকালে যথারীতি স্ত্রীর বাসায় গিয়ে কুপার দেখেন স্ত্রী মৃত অবস্থায় বারান্দায় পড়ে আছেন। গলায় গামছা জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ভদ্রমহিলা যে প্রাণপণ শক্তিতে আততায়ীর সঙ্গে যুঝেছিলেন তার যথেষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেল। দেখা গেল বাড়ির মূল্যবান দ্রব্যাদি সবই অপহৃত হয়েছে।

জোর পুলিশ তদন্ত চলল। কুপার আততায়ীকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা গেল না, খুনেরও কোনো কিনারা হল না।

এই ঘটনার পর থেকে রটে গেল বাড়িটা 'হানাবাড়ি'। হানাবাড়িতে কে বাস করতে যাবে! বাড়িটা অনেককাল খালি পড়ে থাকল।

কয়েক বছর বাদে কি একটা কাজে ছু'জন নীলকর সাহেব কলকাতা এলেন। কার্যব্যপদেশে কলকাতায় কিছুদিন থাকতে হবে। মফঃস্বলের লোক। কলকাতার খবরাখবর তাঁরা জানেন না। তুই বন্ধুতে মিলে বাড়িটা তাঁরা ছ'মাসের জন্য লীজ নিয়ে নিলেন।

একদিন তুই বন্ধুতে নাচ-গানের ছু'খানা টিকিট কিনলেন। কিন্তু একজনের হঠাৎ জ্বর হয়ে যাওয়ায় তিনি যেতে পারলেন না। অপর বন্ধু তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে

চাইলেন না ; তিনি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নাচ-গানের আসরে পাঠিয়ে দিলেন। সে রাত্রে তিনি হল ঘরে শুয়ে রইলেন। পরদিন সকালে উঠে নাচ-গানের আসর থেকে কোনো বান্ধবী পাকড়ে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য বন্ধুকে এক হাত নিলেন।

বন্ধু তো আকাশ থেকে পড়লেন। না, কখ্খনো না। আমি কউকে নিয়ে আসিনি। আসলে জ্বরের ঘোরে তুমি খোয়াব দেখেছ। আচ্ছা, কি দেখেছ বল তো।

বন্ধু জবাব দিলেন, মধ্যরাত্রির কিছু পরে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তোমার ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। লম্বা-চওড়া চেহারা মহিলার—বেশ সুন্দরী—ইউরোপীয়ও হতে পারেন, আবার ইউরেশীয় হওয়াও অসম্ভব নয়। মহিলা হল পেরিয়ে বারান্দার দিকে গেলেন। আমি জেগেই ছিলাম। ভদ্রমহিলার গলায় এক টুকরো কাপড় কম্ফার্টারের মতো জড়ান ছিল। কৌতূহল হল। আমি মহিলাকে আর একবার ভালো করে দেখবার জন্য উঠে বারান্দার দিকে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে মহিলা চলে গেছেন।

এই বর্ণনা শুনে অপর বন্ধু তো থ মেরে গেলেন। চাকর-বাকরদের কাছে খোঁজ করা হল সেই রাত্রে তারা কাউকে নিচে নামতে দেখেছে কি না। কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোল। জানা গেল বাড়িটা হানাবাড়ি। নীলকর সাহেব দু'জন বাকী ক'মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে বাড়ি থেকে সরে পড়লেন।

সে-বাড়িটা এখন আর নেই। এখন সেখানে বাঙালী খ্রীস্টানদের মেথডিস্ট গীর্জা হয়েছে।

— রহস্যময় আলো —

বিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার কোনো একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে চন্দননগরের এক সংবাদদাতার নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল :

"প্রতিদিন রাত্রে চন্দননগরের ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল (হুগলির দিককার) পোস্টের কাছে একটি রহস্যজনক আলোর সিগন্যাল দেখা যায়। এ সম্পর্কে অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। সবচেয়ে চালু গল্পটি হলো : চন্দননগরে যখন প্রথম রেললাইন বসে তখন ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে জনৈক গার্ডের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। সেই থেকে নাকি সে রোজ নানা চেহারায় আবির্ভূত হয়ে আলোর সিগন্যাল দেখিয়ে থাকে। আলোটাই শুধু দেখা যায় কিন্তু প্রেতমূর্তি অদৃশ্যই থাকে। আলোটা কখনও দপ্‌দপ্‌ করে কখনও স্থির হয়ে জ্বলে। বিশ গজ দূর থেকে আলোটা দেখা যায়। তার বেশি এগোবার চেষ্টা করলে আলোটা অদৃশ্য হয়ে যায়। শান্টিং জমাদারের সঙ্গে ভূতটার খুব দোস্তি হয়ে গেছে। জমাদার বলে সে যখন লাল আলো দেখায় ভূতটা তখন দেখায় লাল আর সবুজ আলো। সবুজ আলো দেখালে কিন্তু ভূতটা কোনো বাধা দেয় না। গতকাল যদিও মেঘলা ছিল তবু রাত্রিবেলা প্লাটফর্ম থেকে আলোটা আবার দেখা গেছে। আমি ৩৩নং আপ গাড়ির গার্ডকে অনুরোধ

করেছিলাম তিনি আলোটার দিকে যেন নজর রাখেন এবং লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেন আলোর পিছনে কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু ট্রেনটা আলোর সমীপবর্তী হবার আগেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

"আপনার পাঠকদের মধ্যে যাঁরা কখনও ভূত দেখেন নি বা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না তাঁরা অনুগ্রহ করে চন্দননগর পর্যন্ত এলেই নিজেদের সন্দেহভঞ্জন করতে পারবেন। ব্যাপারটা সত্যিই অনুসন্ধান করে দেখবার মতো।"

পিয়ানোর ভূত

কলকাতা হিস্টোরিকাল সোসাইটির জনাব আবদুল আলি শ্রীমতী ডি-র কাছ থেকে নিচের গল্পটি শুনেছিলেন:

"১৯২৬ সালে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে আমি কিছুকাল বাস করেছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ থ্যাকারে এই বাড়িতে কিছুদিন বাস করেছেন। তাঁর পুত্র বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকার তখন বালক ছিলেন। সেকেলে ধরনের প্রকাণ্ড বাড়ি—প্রশস্ত লন, একদিকে আম-লিচুর বাগান। বাড়িটার একদিকে টালির নালা আর একদিকে জেল-খানার প্রকাণ্ড দেয়াল।

"একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে শুনি কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। ভারী মিষ্টি হাত। আশ্চর্য হলাম। আমাদের বাড়িতে পিয়ানোও ছিল না, রেডিও-ও না।

"কিছুদিন বাদে এক মহিলা আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে

এলেন। প্রথম দিন সান্ধ্য-চায়ের আসরে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার পিয়ানোর হাত খুব মিষ্টি। বিকেলবেলায় আপনার বাজনা খুবই উপভোগ করেছি।'

"আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, 'আমাদের বাড়িতে পিয়ানো নেই।'

"১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডে ফিরে সার জেমস ও লেডি ডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। সার জেমস প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে বাস করেছেন। লেডি ডোনাল্ডের ছিলেন সঙ্গীত পটিয়সী। তিনি যেবার ও-বাড়িতে এসেছিলেন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন একটা দামী পিয়ানো। যুদ্ধশেষে সার জেমস যখন সপরিবারে দেশে ফিরে যান তখন জাহাজে স্থানাভাববশত পিয়ানোটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর অতি প্রিয় বাদ্য-যন্ত্রটি হাতছাড়া হওয়ায় লেডি ডোনাল্ডের মা খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে তিনি মারা যান। আমার কাছ থেকে রহস্যময় পিয়ানো বাজনার কাহিনী শুনে লেডি ডোনাল্ড বললেন, এ নিশ্চয়ই তাঁর মায়ের প্রেতাত্মা। ঐ বাড়িতে পিয়ানোটা ফেলে রেখে গিয়েছিলেন বলেই ওখানে তিনি আনাগোনা করছেন।

"আমার স্বামী কিন্তু বলেন, মানুষের ভূত তবু বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু পিয়ানোর ভূত? না বাপু, অতটা বিশ্বাস করতে পারব না।"

কিংবদন্তীর নায়ক ও নায়কের কিংবদন্তী

কথায় আছে, রোম শহর নাকি একদিনে গড়ে ওঠেনি। কোনো শহরই একদিনে গড়ে ওঠে না, উঠতে পারে না। কথাটা কলকাতা শহর সম্পর্কেও সত্যি।

শহর কলকাতার প্রাচীনত্বের দাবি অবশ্য খুব বেশি দিনের নয়। যোব চার্নককে যদি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা ধরি এবং যদি ধরি ১৬৯০ সালের অগস্ট মাসের যে মধ্যাহ্নে সুতানুটি গ্রামে এসে তিনি অবতরণ করেছিলেন, শহর কলকাতার সেটাই প্রতিষ্ঠা দিবস তাহ'লে কলকাতার বয়স হবে তিনশ বছরেরও কম।

শহর না হোক, যে তিনটি গ্রাম নিয়ে আদি কলকাতার পত্তন তার ইতিহাস অবশ্য আরও পুরনো এবং যোব চার্নক তথা ইংরেজরা হয়তো নন কলকাতার প্রথম বিদেশী বনিকও। শহর কলকাতায় সবচেয়ে পুরনো যে কবরটির সন্ধান পাওয়া যায় সেটি এক আর্মেনিয়ান মহিলার। নাম রোজাবিবা। দানবীর

সুকিয়াসের স্ত্রী। সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ মৃত্যুর তারিখ ১১ জুলাই ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই তারিখটা মানতে চান না। তাঁরা দাবি করেন, খোদাইকার নিশ্চয়ই ভুল করেছেন কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে ফলকটি এনে ঐ সমাধিক্ষেত্রে স্থাপন করেছেন। তাঁদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে তাঁরা অবশ্য বিশেষ কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারেন নি, শুধু জোর গলায় তাঁদের বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। এবং গলার জোর আর গায়ের জোরের চেয়ে বড় যুক্তি আর কী আছে! তাঁদের হয়তো ধারণা, এই কবরের সাক্ষ্যটি মেনে নিলে, যোব চার্নক তথা ইংরেজরাই



যে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, এ-দাবি হয়তো মিথ্যে হয়ে যাবে।

কিন্তু এরকম আশঙ্কার সত্যিই কি কোনো কারণ আছে? হতে পারে ইংরেজদেরও আগে কোনো কোনো বিদেশী বণিক হয়তো সুতানুটী-গোবিন্দপুরে এসে বসতি করেছিলেন, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যেও নিযুক্ত হয়েছিলেন, তবু একথা তো মিথ্যে হবার নয় যে আধুনিক নগরী হিসেবে কলকাতা গড়ে উঠেছিল সুতানুটীতে ইংরেজরা বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের সূত্রেই। আর সে কুঠিও স্থাপিত হয়েছিল যোব চার্নক ১৬৯০ সালের অগস্টের এক মধ্যাহ্নে সুতানুটী গ্রামে বিশ্রাম করেছিলেন বলেই।

কলকাতা শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ইট-কাঠ-লোষ্ট্র ও প্রস্তরের যে কলকাতায় আজ আমাদের বাস তা গড়ে উঠতে লেগেছে প্রায় তিনশ বছর। অতএব এই শহর প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কোনো এক ব্যক্তির প্রাপ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন সংগতভাবেই উঠতে পারে। আর যোব চার্নক তো কলকাতায় বাস করেছিলেন মাত্র দু' বছর। (সুতানুটীতে তিনি এসে শিবির স্থাপন করেছিলেন ১৬৯০ সালে আর তার মৃত্যু হয় ১৬৯২ সালের ১০ জানুয়ারি মাসে।) তবু একথা তো মিথ্যে নয় তার সেদিনকার মধ্যাহ্নের যাত্রাবিরতির সূত্রেই আধুনিক কলকাতা নগরীর পত্তন।

শহর কলকাতার কিংবদন্তীর এই আদি পুরুষটির পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে খুব কম তথ্যই কিন্তু আমাদের জানা আছে, যদিও কিংবদন্তীর এই নায়কটি সম্পর্ক কিংবদন্তীর অভাব নেই।

এক ভারতীয় লেখকেরই একটি গবেষণা-গ্রন্থ থেকে সম্প্রতি

অবশ্য যোব চার্নকের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে যৎসামান্য কিছু তথ্য জানা গেছে। সেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তথ্য থেকে জানতে পারি চার্নকদের আদি বাসস্থান ল্যাঙ্কাশায়ার। পরে ষোড়শ শতাব্দে এই পরিবারের একাংশ এসে লণ্ডন শহরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। যোব চার্নকের পিতা রিচার্ড চার্নক ছিলেন লণ্ডনের নাগরিক। যোব চার্নকের এক ভাই ছিল, তাঁর নাম স্টিফেন চার্নক। স্টিফেন ছিলেন একজন ধর্মযাজক।

যোব চার্নকের জন্ম সম্ভবত ১৬৩১ সালে। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

যতদূর জানা যায় যোব চার্নক ভারতে এসেছিলেন ১৬৫৬ সালে। তবে হয়তো পেণ্ডন কোম্পানীর চাকরী নিয়ে তিনি আসেন নি। হয়তো এসে পড়েছিলেন ভবঘুরে হিসেবেই। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর চাকরীতে ঢোকেন এবং কাশিমবাজারে কৌন্সিলের জুনিয়র সদস্য নিযুক্ত হন।

কিন্তু কাশিমবাজারে তাঁকে যেতে হয় নি, কোম্পানীর বাংলাদেশের এজেন্ট তাঁকে হুগলীতেই রেখে দেন। হুগলীতে কিছুকাল থাকার পর ১৬৫৯ সালে চার্নক যান পাটনাতে। পাটনাতে তিনি বিশ বছর কাটিয়েছেন। ১৬৬৪ সালে তিনি পাটনা ফ্যাক্টরির প্রধানের পদ লাভ করেন। চার্নক নিশ্চয়ই তাঁর কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় ধাপে ধাপে তার পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি ঘটছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য কয়েকবারই তিনি দেশে ফিরে যাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতেই থেকে যান।

—২

শেষ পর্যন্ত ১৬৭৯ সালে তিনি তৎকালের প্রধান রেশম কেন্দ্র কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরিসমূহের প্রধান নিযুক্ত হন। কিন্তু পাটনায় কিছু কাজ থাকায় কর্মভার গ্রহণ করতে বিলম্ব ঘটে। এবারেও কিন্তু কাশিমবাজারে তাঁর থাকা হয় না। দেশীয়দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে এবং তাদের অবরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি হুগলী পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

এই সময় বাংলাদেশে কোম্পানীর বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটছিল। কাজেই চার্নকের মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পেয়ে তাঁরা যেন হাতে স্বর্গ পান। অতএব চার্নক আবার হুগলীতেই থেকে যান এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৮৬ সালে বাংলাদেশে কোম্পানীর এজেন্ট নিযুক্ত হন।

ঠিক এই সময়ই বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে মোগলদের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ বাধে। ছোটোখাটো সংঘর্ষও বাধতে থাকে। কোম্পানী ভয় পেয়ে চার্নকের অধীনে কিছু সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। বাংলার নবাব শায়েস্তা খান বাধ্য হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আপস করেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত শায়েস্তা খানের সঙ্গে চার্নকের বাহিনীর যুদ্ধ বেধে যায়। চার্নক শায়েস্তা খানের বাহিনীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে নদীপথে অগ্রসর হয়ে সুতানুটী ঘাটে এসে অবতরণ করেন। এখনকার উত্তর কলকাতার চিৎপুর শোভাবাজার হাটখোলা ইত্যাদি অঞ্চল ছিল সুতানুটি গ্রামের অন্তর্গত। সুতানুটীতে

সেকালে সুতোর বাজার বসত। সুতানুটি নাম এই বাজার থেকেই।

এখানে অল্পকাল অবস্থান করে চার্নক হিজলীর দিকে অগ্রসর হন। এখানে ১২ হাজার মোগল সৈন্যের এক বাহিনীর সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা কম হলে হবে কি, চার্নক এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন যে মোগলদের কাছে মনে হয় ইংরেজরাই দলে ভারী। মোগলরা থমকে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত চার্নকের সঙ্গে আবার সন্ধি করে।

এদিকে এই গোলমালের ফলে মোগলদের রাজস্বেও ঘাটতি পড়ছিল। এ-কারণে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বাংলার নবাবকে নির্দেশ দেন ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। সম্রাটের আদেশে বিরোধ মেটে, ইংরেজরা উলুবেড়িয়ায় ডক নির্মাণেরও অনুমতি পান। কিন্তু চার্নক শায়েস্তা খাঁর মতিগতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাই উলুবেড়িয়া থেকে আস্তানা গুটিয়ে আবার চলে আসেন সুতানুটিতে। এবার প্রায় এক বৎসরকাল তিনি এখানে ছিলেন। ফলে কাদামাটির একটা উপনিবেশও এখানে গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু চার্নক এবারেও এখানে থিতু হয়ে বসতে পারলেন না। কোম্পানীর ডিরেকটাররা মতলব আঁটেন চট্টগ্রাম দখল করে নিয়ে সেখানেই বাংলাদেশের সদর বাণিজ্যদপ্তর স্থাপন করবেন। এই মতলব হাসিল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্যাপটেন উইলিয়ম হীথের উপর। সুতানুটি এসে ক্যাপটেন হীথ চার্নক এবং তাঁর কৌন্সিলের পরামর্শ উপেক্ষা করে ওখান থেকে তল্পিতল্পা

গুটোবার আদেশ দেন। তদনুসারে ইংরেজ ফ্যাক্টররা কারবার গুটিয়ে হীথের অনুগমন করতে বাধ্য হন। হীথ কিছুদূর এগিয়ে বালেশ্বর দখল করে নেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁর উত্তরসূরী বাহাদুর খাঁ ইংরেজদের শর্ত মানতে রাজী ছিলেন না। ফলত হীথকে ওখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হতে হয়। কিন্তু স্থানীয় রাজার বিরোধিতার ফলে চট্টগ্রামেও ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। চট্টগ্রাম অভিযান ব্যর্থ হবার পর ইংরেজদের গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জে।

বাংলাদেশে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে শুধু যে ইংরেজদেরই ক্ষতি হয় তা নয়, মোগলদেরও রাজস্ব খাতে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেব অতএব নবাব ইব্রাহিম খাঁকে (ততদিনে ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর খাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন) এক পত্রে জানান, ইংরেজরা তাদের বে-আইনি কার্যকলাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছে এবং মার্জনা ভিক্ষা করেছে। সম্রাট তাদের মার্জনা করেছেন। অতএব ইব্রাহিম খাঁ যেন আর তাদের সঙ্গে কোনো গোলমাল না বাধান। ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় লোক। সম্রাটের এ-আদেশ তিনি হৃষ্টচিত্তেই মেনে নিলেন।

বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিতে হবে এই শর্তে সম্রাট ইংরেজদের বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। বাধ্য হয়ে প্রায় ১৫ মাস ফোর্ট সেণ্ট জর্জে অবস্থান করার পর সদলবলে চার্নক আবার সুতানুটী অভিমুখে যাত্রা করেন।

সুতানুটি এসে পৌঁছান ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট। এই তাঁর তৃতীয় এবং শেষবারের মতো সুতানুটি আসা। দু বছর পরে এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। সেণ্ট জর্জ গীর্জার প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এখানে তাঁর একটি সমাধি সৌধ এখনো আছে।

২৪ অগস্ট, ১৬৯০ এই তারিখটি কলকাতার ইতিহাসে স্মরণযোগ্য। যদি মেনে নেওয়া যায় সুতানুটিতে চার্নকের এই তৃতীয়বার আগমনের সূত্রেই কলকাতা নগরীর উৎপত্তি তাহলে এই তারিখটিই এই শহরের প্রতিষ্ঠা দিবস।

চার্নক নিজেই নিতান্ত রসকসহীন ভাষায় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

"১৬৯০, ২৪ অগস্ট। এই দিনটিতে, সাঁকরাইলে ক্যাপ্টেন ব্রুককে আদেশ দিলাম তার জাহাজ নিয়ে সুতানুটিতে আসতে। মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছলাম সেখানে। কিন্তু সেখানে এসে দেখলাম অবস্থা শোচনীয়, মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই নেই। অথচ রাতদিন বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা বাধ্য হলাম নৌকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে। এই মরশুমে এটা খুবই অস্বাস্থ্যকর। আমরা চলে যাবার পর মল্লিক বৃকোদর এবং দেশীয় লোকেরা যা পেরেছে নিয়ে গেছে আর বাকীটা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।"

এর আগেরবার সুতানুটি এসে চার্নক যখন প্রায় বছর দেড়েক অবস্থান করেছিলেন তখন কিছু কাঁচা ঘরবাড়ি তৈরী করিয়ে-ছিলেন মাথা গোঁজার জন্য। চার্নক এখানে তারই উল্লেখ করেছেন।

যদি বলি, শহর কলকাতারই শুধু নয়, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও সূচনা হয়েছিল এইভাবে, তাহলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু সে অন্য গল্প, অন্য সময় বলা যাবে। আমরা আপাতত চার্নক-কাহিনীতেই ফিরে আসব।

কেমন মানুষ ছিলেন চার্নক? এ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। সে সবের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, মানুষটা তিনি সম্ভবত সৎ ছিলেন। সেকালে কোম্পানীর কর্মচারীরা—রাইটার ফ্যাক্টররা ইণ্টারলোপিং করে বেশ দু-পয়সা করত। এ-অভিযোগ কেউ চার্নকের বিরুদ্ধে করে নি। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর তিনি ভারতে ছিলেন কিন্তু তেমন কিছু সম্পত্তি তিনি করে রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর উইলই তার প্রমাণ।

লেখা-পড়া তিনি কতদূর করেছিলেন জানা যায় না, হয়তো বেশীদূর করেন নি। কথাবার্তায় হয়তো কিছুটা ছিলেন উদ্ধত দুর্বিনীত; খুব জেদী এবং একগুঁয়ে। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে সাম্রাজ্য পত্তনের যুগে এমন মানুষেরই দরকার সব চাইতে বেশী। কারোর কারোর অভিযোগ, মানুষটা নাকি ছিল খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির, পান থেকে চুন খসলেই চাবকে লাল করতেন চাকর-বাকরদের। আবার অন্যেরা বলেন, নিষ্ঠুর নয়, কড়া লোক ছিলেন চার্নক। 'গয়ং গচ্ছ' ভাব দু-চোখের বিষ ছিল তাঁর। আবার তাদের ভালোও বাসতেন, উইলে দুই চাকরের জন্যই কিছু সংস্থান রেখেছিলেন।

সমসাময়িক যে সব বিবরণে চার্নকের দোষ-গুণের বিচার পাওয়া যায় তা কিন্তু তেমন নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা তার

কোনটাতেই পাওয়া যাবে না নিরপেক্ষ বিচার। কিন্তু এ-সব বিবরণ থেকেও একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, চার্নক এমন একজন মানুষ ছিলেন শুধু সাদা আর কালো রঙ ব্যবহার করে যাঁর প্রতিকৃতি রচনা সম্ভব নয়।

এ দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করে দেশীয় পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ অনেকটাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি পরচুলা ছেড়েছিলেন, চুল ছেঁটে ফেলেছিলেন ছোট করে, ঢিলেঢালা জামা-কাপড়ও পরতেন অনেকটা ভারতীয় ধরনের। ফার্সী ভাষা বলতে পারতেন অনর্গল। আলবোলায় তামাক খেতেন, আরক পাঞ্চ খেতেন, এমনকি খানিকটা নাকি পৌত্তলিকতাতেও বিশ্বাসী হয়েছিলেন, যদিও অন্যেরা জোর গলায় এ-অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন।

এখন শেয়ালদার কাছে যে অঞ্চলটা বৈঠকখানা বলে পরিচিত, লোকে বলে সেখানে এক বটগাছতলায় বসে গড়গড়া খেতে খেতে চার্নক নাকি দেশীয় এবং ইংরেজ ব্যাপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, দরদস্তুর ঠিক হত। সারাদিন নাকি তার এইখানেই কাটত। তবে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই দরবার শেষ করতে হয়। কেননা তখন চোর ডাকাতের বড়ই উপদ্রব ছিল। এখন অবশ্য অনেকে বলছেন, জায়গাটা বৈঠকখানা নয়, নিমতলার কাছে এবং গাছটাও বটগাছ নয়, নিম গাছ। কিন্তু বটই হোক আর নিমই হোক, এবং জায়গাটা শেয়ালদাই হোক আর নিমতলাই হোক চার্নকের বৈঠকখানা যে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছিল তা নিয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই।

কিন্তু গল্পের শেষ নেই, তর্কেরও না—চার্নক এবং তাঁর হিন্দু স্ত্রী সম্পর্কে। সেকালে অবশ্য এরকম ঘটনা বিরল ছিল না। তখন বৌ নিয়ে এদেশে আসার অনুমতি মিলত না কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের। এদেশে এসে তারা অনেকেই ভারতীয় রমণীদের সঙ্গে বসবাস করতেন, কেউ কেউ বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতেন। কিন্তু চার্নকের ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। এবং বেশ কিছুটা রোম্যান্টিক।

সবচেয়ে প্রচলিত গল্পটা এই রকম :

পাটনা অবস্থানকালে চার্নক নাকি একদিন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একটি সতীদাহ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির রূপ দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে সঙ্গের রক্ষীদলের সাহায্যে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে তোলেন। মেয়েটি নাকি ছিলেন ব্রাহ্মণ কন্যা। চার্নক মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করেন। কয়েকটি সন্তানও হয় তাঁদের। কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবার পর এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখন যেখানে চার্নকের সমাধি সেখানেই নাকি তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুদিনে চার্নক নাকি এই সমাধিস্থলে একটি করে মুরগী বলি দিতেন। এ-কাহিনী হ্যামিলটনের। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বেশ রসিয়েই বর্ণনা করা হয়েছে গল্পটি। হ্যামিলটনই বলেছেন, মেয়েটি নাকি চার্নককে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী করে তুলেছিলেন।

সমসাময়িক আর একজন, উইলিয়ম হেজেসের বিবরণ কিন্তু

অনুরূপ। হেজেসের দিনলিপিতে কিন্তু ভারতীয় রমণীটি ব্রাহ্মণ কন্যাও নয়, উদ্ধারপ্রাপ্তা সতীও নয়। মেয়েটি ছোটো জাতের এবং তিনি ছিলেন চার্নকের রক্ষিতা। স্বামী বর্তমানেই তিনি নাকি চার্নকের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। এ নিয়ে বেশ গোলমাল হয়েছিল এবং বেশ কিছু অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি উৎকোচ দিয়ে গোলমাল মেটাতে হয়েছিল চার্নককে।।

দুটি গল্পই কিংবদন্তী এবং কোনটিরই সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। হ্যামিলটনের গল্পটিই বেশি প্রচলিত এবং সে-কাহিনী অন্তত দুজন বাঙালী লেখককে সাহিত্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

তবে এই সব কিংবদন্তী একেবারে হয়তো মিথ্যে নয়। চার্নক সত্যিই একজন ভারতীয় রমণীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিয়ে হয়তো হয়নি, কিন্তু তাহলেও তৎকালীন ইওরোপীয় সমাজ এ সম্পর্ককে মেনে নিয়েছিল। চার্নকের তিন কন্যা—মেরি, এলিজাবেথ এবং ক্যাথরিন। এদের বিবাহ হয়েছিল সম্ভ্রান্ত বংশে। মেরির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল চার্লস আয়রের, এলিজাবেথের সঙ্গে উইলিয়াম বাওরিজের এবং ক্যাথরিনের সঙ্গে জোনাথান হোয়াইটের। চার্লস আয়র পরে চার্নকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। চার্লস আয়রই চার্নকের সমাধিসৌধ নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। জোনাথান হোয়াইট বেঙ্গল কৌন্সিলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন আর উইলিয়ম বাওরিজ ছিলেন একজন বিশিষ্ট বণিক।

চার্নকের ভারতীয় পত্নীর উল্লেখ কোনো সরকারি দলিলে নেই। চার্নকের তিন কন্যার ব্যাপাটিজম হয়েছিল মাদ্রাজে। কিন্তু গীর্জার নথীপত্রে চার্নকের স্ত্রী অর্থাৎ কন্যার মাতার কোনো উল্লেখ নেই। কোম্পানীর দলিল-দস্তাবেজের একটি চিঠিতে এই ভারতীয় রমণী সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ আছে।

এই চিঠি থেকে মনে হয় চার্নকের ভারতীয় স্ত্রী ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন না, ছিলেন নিম্নবর্ণের। তাঁদের মধ্যে সম্ভবত আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়নি। হয়তো সে কারণেই চার্নক কন্যাদের ব্যাপটিজম সংক্রান্ত নথীপত্রে মাতার নাম নেই।

ব্রাহ্মণ কন্যাকে চিতা থেকে ছিনিয়ে নেবার গল্পটিও ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। যে সময়ের কথা, তখনও মোগলেরা রাজত্ব করছে। এই রকম একটি কাজ করে চার্নক সহজে পার পেতেন না। তাছাড়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে কবর দেওয়া হবে কেন, আর কেনই বা তার কবরে মুরগী বলি দেওয়া হবে? মুরগী কি হিন্দুদের কাছে পবিত্র প্রাণী?

চার্নক সুতানুটিতে শেষবারের মতো এসেছিলেন ১৬৯০ সালে। দু বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। চার্নকের পত্নী নাকি কলকাতাতেই দেহরক্ষা করেন। অর্থাৎ ধরে নিতে হয় তিনি মারা গেছেন ১৬৯০ সালের পরে। তাহলে বছর বছর মুরগী বলি দেবার সুযোগই বা তাঁর জোটে কি করে?

চার্নক পৌত্তলিক বনে গিয়েছিলেন এইটে প্রমাণ করার জন্যই সম্ভবত হ্যামিলটন সাহেব গল্পটি রচনা করেছিলেন।

কিন্তু হ্যামিলটন সাহেবের এই অভিযোগ যদি সত্য হবে

তাহলে চার্নক কেন তাঁর কন্যাদের ব্যাপটিজম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন? তাছাড়া যেহেতু তিনি তাঁর স্ত্রীকে সমাহিত করেছিলেন সেহেতু মনে হয় এই ভারতীয় রমণীকেও খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল।

পত্নীর কবরে চার্নককে সমাহিত করা হয়েছিল—এই গল্পেরও কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। চার্নকের সমাধি ১৮৯২ সালে একবার খোঁড়া হয়েছিল কিন্তু কিছুদূর খোঁড়ার পর চার্নকের অস্থি উন্মোচিত হয়ে পড়ায় খননকার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাজেই ঐ একই কবরে চার্নক-পত্নীও শায়িত কিনা জানা যায়নি। সমাধি ফলকে পত্নীর কোনো উল্লেখ নেই। চার্নকের জ্যেষ্ঠা কন্যা যে ঐ একই কবরে শায়িতা তাতে সন্দেহ নেই। চার্নকের সমাধিসৌধে কন্যার সমাধি-ফলক আছে।

চার্নক এবং তার ভারতীয় পত্নী সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তার সত্যাসত্য যাই হোক, কাহিনী এমনই রোম্যান্টিক যে আমাদের কল্পনাশক্তি স্বতঃই তা থেকে রস আহরণ করে এবং হয়তো করবে নিরবধিকাল।

বাংলার শেষ সতীদাহ

সতীদাহ কথাটা এখন অভিধানের পৃষ্ঠায় মুখ লুকিয়েছে। মৃত-পতির চিতায় বিধবা পত্নীকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে—এরকম নৃশংসকাণ্ড এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্বেও এদেশে এ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

বিধবা স্ত্রীকে যে সহমৃতা হতে হবে হিন্দু-শাস্ত্রে এরকম কোন বিধান নেই। এটা ছিল নেহাতই সংস্কার। কিন্তু সংস্কার যে মানুষকে কতদূর নৃশংস করে তুলতে পারে তার একটি চিত্র পাওয়া যায় লর্ড আমহার্স্টের পত্নীর রোজনামচায়। আমহার্স্ট পত্নী লিখেছেন:

"জনৈক যুবক কলেরায় মারা গেলে তার বিধবা পত্নী সহমৃতা হবার সংকল্প করেন। তদনুযায়ী ব্যবস্থাদি করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি-পত্রও সংগ্রহ করা হয়। নিকটতম আত্মীয়েরা চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। কিন্তু অগ্নিশিখা যখন হতভাগিনীকে স্পর্শ করল তখন তার সাহস উপে গেল।

জনতার কর্ণপটাহবিদারণকারী চিৎকার, ঢাক-ঢোল-কাঁসির বাজনার মধ্যে ধূম্র কুণ্ডলীর আড়ালে সকলের অলক্ষ্যে সে চিতা থেকে নেমে পড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে। সে যে পলায়ন করেছে প্রথমে তা ধরা পড়েনি। কিন্তু ধোঁয়া কেটে যেতে ধরা পড়ে গেল যে, হতভাগিনী চিতায় নেই। হৈ-হৈ পড়ে গেল। ক্রুদ্ধ জনতা জঙ্গল-ঢুঁড়ে হতভাগিনীকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনলো। তারপর একটা ডিঙিতে করে মাঝ নদীতে নিয়ে গিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। হতভাগিনী সেই যে ডুবল আর ওঠেনি।"

এই ঘটনা সেকালে বাংলাদেশে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এরপর রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সবিশেষ জোরদার হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করে এক আইন জারী করেন। তারপরই এই নৃশংস-প্রথার অবসান ঘটে। এখন তা অতীতের দুঃস্বপ্ন মিশ্রিত একটা স্মৃতিমাত্র।

এই আইন যখন জারী হয় সার হ্যালিডে (পরে যিনি বাংলার ছোটলাট হয়েছিলেন) ছিলেন হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আইন চালু হবার আগে হুগলীতে একটি সতী-দাহের ঘটনা ঘটেছিল। সার হ্যালিডের মতে এইটেই বাংলাদেশে শেষ সতীদাহ। সার হ্যালিডে এই শেষ সতীদাহের একটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর মধ্যে কতটা কল্পনা আর কতটা সত্য তা এখন আর যাচাই

করে দেখার উপায় নেই—কিন্তু কাহিনীটি যে গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর তাতে সন্দেহ নেই।

সার হ্যালিডে লিখেছেন: ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহপ্রথা নিবারণ করা হয়। সেই সময় আমি হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আইন চালু হবার কিছুদিন আগে আমাকে জানানো হল যে, আমার বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি সতীদাহ অনুষ্ঠিত হবে। হুগলীতে এই ধরনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটত। লোকের ধারণা ছিল, নদীর এই পাড়টাই এইরূপ পুণ্যের কাজের পক্ষে প্রশস্ত।

খবরটা যখন আমার কাছে পৌঁছাল তখন চিকিৎসা বিভাগের ডাঃ ওয়াইজ এবং গভর্ণর-জেনারেলের (ভদ্রলোকের নামটা আমার মনে নেই) পুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই অনুসারে গাড়ী করে আমরা নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে যাত্রা করলাম। তখন নদীর পাড়ে দেশীয় লোকদের একটি ভিড় জড়ো হয়ে গেছে। চিতা জ্বালানো হয়েছে। যিনি সতী হবেন তিনি সেই জ্বলন্ত চিতার সামনে মাটিতে বসে আছেন। আমাদের বসতে দেবার জন্যে চেয়ার আনানো হলো। আমরা মহিলাটির সন্নিকটে বসলাম। আমার সঙ্গীদ্বয় দেশীয়-ভাষা না জানলেও মহিলাকে এই কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। তাদের বক্তব্য আমি মহিলাকে তার ভাষায় তর্জমা করে শোনাতে লাগলাম। মহিলা সশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি কথা শুনলেন। কিন্তু

আমাদের যুক্তি তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। পুরোহিত এবং সমবেত জনতাও মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

অবশেষে মহিলার মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল। তিনি চিতায় প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমাদের করার আর কিছু নেই দেখে আমি মহিলাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু চিতায় আরোহণের পূর্বে পাদ্রী-সাহেব মহিলাকে আর একটি প্রশ্ন করতে অনুরোধ করলেন: "মহিলা কি জানেন, কি নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হবে?"

ভদ্রমহিলা আমার পায়ের কাছে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলাম তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত-মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে। প্রশ্নের জবাবে মহিলা বললেন—একটা প্রদীপ আনান।

প্রদীপ আনানো হলো—নৌকো-ধরনের যে প্রদীপ চাষীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে এলো ঘি আর বেশ বড় একটা সল্‌তে।

প্রদীপটা মহিলা নিজেই যথারীতি সাজালেন। তারপর বল্‌লেন—এইবার জ্বালান।

প্রদীপটা জ্বালিয়ে মহিলার সামনে রাখা হলো। তারপর উপেক্ষার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে মহিলা মাটিতে কনুই রেখে একটা আঙুল প্রদীপের শিখার উপর ধরলেন। আঙুলটা পুড়ে ফোস্কা উঠলো তারপর কালো হয়ে ঝুলে পড়লো—পালকের কলম মোমবাতির উপর ধরলে যেমনটি হয়। মহিলা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আঙুল সরালেন না। একটি শব্দ

করলেন না বা তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একটুও পরিবর্তিত হলো না। এইরকম কিছুক্ষণ চল্‌লো। তারপর ভদ্রমহিলা বল্‌লেন : এইবার আপনার সন্দেহভঞ্জন হয়েছে তো ?

আমি বল্‌লাম হাঁ, হয়েছে।

মহিলা তখন আঙুল সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন : এইবার তাহলে আমি চিতায় আরোহণ করতে পারি ?

আমরা সম্মতি দিলাম।

ভদ্রমহিলা তখন ধীরে ধীরে চিতায় আরোহণ করলেন।

নদীর-পাড় ঘেঁষে চিতাটি রচনা করা হয়েছিল। চিতাটি



ছিল প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু এবং প্রায় অতটাই লম্বা। চওড়া ছিল প্রায় তিন ফুট। মহিলাকে বার-তিনেক চিতাটি প্রদক্ষিণ করান হল। তারপর তিনি চিতায় আরোহণ করলেন। উপুড় হয়ে হাতের উপর মুখ রেখে মহিলা চিতার উপর শুলেন—যেন ঘুমুতে যাচ্ছেন। মহিলার উপর তারপর আর এক-পর্দা কাঠ চাপানো হল। ইচ্ছে করলেও যাতে তিনি চিতা ছেড়ে বেরোতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে জনতা তাকে চিতার সঙ্গে বাঁধতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম। তারা অনিচ্ছার সঙ্গে আমার নিষেধ শুন্‌লো। এইবার তার ছেলেকে ডাকা হলো চিতায় আগুন দিতে।

ভদ্রমহিলার স্বামী দূরদেশে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর দেহ আনা সম্ভব হয়নি। তার বদলে তাঁর পরিধেয়র কিছু অংশ মহিলার সঙ্গে চিতায় দেওয়া হলো। তারপর ধূপের গুঁড়ো আর ঘি দিয়ে চিতা জ্বেলে দেওয়া হলো। প্রথমে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠলো পাক-খেয়ে তারপর দপ করে জ্বলে উঠলো চিতা। আগুনের তাপ অসহ্য না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি চিতার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু কোনরূপ নড়াচড়া বা যন্ত্রণার আর্তনাদ আমি শুনতে পাইনি।

যে পুত্র চিতায় অগ্নি-সংযোগ করেছিল, সে-ও চিতার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এইভাবে হুগলী জেলার এবং সম্ভবত বাংলাদেশের শেষ আইনসম্মত সতীদাহ অনুষ্ঠিত হলো।"

প্রেমের সমাধি

পার্ক স্ট্রীট এখন কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত এলাকা। বিরাট বিরাট বহুতল বাড়ি, ঝকমকে দোকান-পাট, বার-রেস্তোরাঁ, নীয়ন আর মার্কারি আলোর ঝলমলানি—মনেই হবে না যে এটা আমাদের এই কলকাতারই একটা অঞ্চল।

আজকের এই ঝকঝকে তকতকে রাস্তাটি কিন্তু এককালে ছিল শহরের বাইরে, আর বাইরে বলেই এ-রাস্তা দিয়ে শবাধার নিয়ে শোভাযাত্রা করে যাওয়া হতো গোরস্থানে। তাই রাস্তাটির নাম তখন ছিল বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড অর্থাৎ গোরস্থানে যাবার রাস্তা। ১৭৯৪ সালে আপজন কলকাতার যে মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন তাতেও রাস্তাটি বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড নামে চিহ্নিত।

ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলকাতায় স্থাপিত হয় প্রথম সুপ্রিম কোর্ট আর এই সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন স্যার এলিজা ইম্পে।

এখন যেখানে মিড্‌লটন রো সেখান দিয়ে এগোলে পড়ত স্যার এলিজার প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং তার সংলগ্ন উদ্যান। এই উদ্যান বা পার্কে যাবার রাস্তা হিসেবেই বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড কালক্রমে হয়ে ওঠে পার্ক স্ট্রীট। তাতে বাড়ে তার সম্ভ্রম এবং আভিজাত্যও নিশ্চয়ই।

কিন্তু বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড নামটি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলে কী হবে, গোরস্থান এখনও আছে, যদিও পরিত্যক্ত। পার্ক স্ট্রীট যেখানে গিয়ে সার্কুলার রোডে পড়েছে সেখানে রাস্তার দুপাশে ছিল দুটি গোরস্থান—উত্তর পার্ক স্ট্রীট গোরস্থান আর দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীট গোরস্থান। দুটি গোরস্থানই অনেককাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটির—উত্তর পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানটির এখন তার অস্তিত্বও নেই। সেখানে এখন স্থাপিত হয়েছে একটি হাসপাতাল।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা যখন নিজেদের নিরাপদ বোধ করল তখন স্থির হলো শহরের জনবসতি থেকে দূরে স্থাপিত হবে নতুন গোরস্থান। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। ১৭৬৭ সালে নতুন গোরস্থান তৈরির কাজ শেষ হয় এবং ২৫ অগস্ট এখানে প্রথম সমাহিত হন কৌন্সিল হাউসের রাইটার মিঃ উড। এই সমাধিটির আর চিহ্ন নেই। পরে আর এক খণ্ড জমি অধিকার ক'রে যখন গোরস্থানের পরিধি বাড়ান হয় তখন এটি লুপ্ত হয়ে যায়।

যখন এই নতুন গোরস্থানটি স্থাপিত হয় তখন এটি সত্যিই ছিল শহরের অনেক বাইরে। চারদিকে ছিল মাঠ। রাস্তাঘাট

ছিল না। গোরস্থানে যাবার জন্যেই নির্মিত হয় একটি রাস্তা—সেকালের বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড, আজকের অভিজাত পার্ক স্ট্রীট।

যাই হোক, উত্তর পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানটি লুপ্ত হয়ে গেলেও দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানটি এখনও আছে। তাতে আছে সেকালের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির সমাধি। ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়বে স্যার উইলিয়ম জোনস-এর সমাধি। স্যার উইলিয়ম ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ডাকসাইটে জজ। কিন্তু সেকারণে নয়, তিনি আমাদের স্মরণীয় ভারততত্ত্ব গবেষণায় তাঁর বিরাট অবদানের জন্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা রূপে। এই গোরস্থানেই অবহেলিত ভাবে একপাশে পড়ে আছে হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর সমাধি, বাংলার নবজাগৃতিতে যাঁর অসামান্য অবদানের কথা সর্বজনবিদিত।

কিন্তু তাঁদের নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনার জন্য এ-নিবন্ধের অবতারণা নয়। এই দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানেই আছে এমন একটি সমাধি যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে না-ফুটতে-ঝরে-পড়া একটি রোম্যান্টিক প্রেমের বেদনাবিধুর কাহিনী। এ-রচনা তারই অনুস্মৃতি।

স্যার উইলিয়মের সমাধির অনতিদূরে দেখা যাবে একটি স্মৃতিসৌধ, কালপ্রভাবে জীর্ণ, তবু সুন্দর। সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ আছে নিম্নলিখিত লিপিটি :

To The Memory of the Honourable
Rose Whitworth Aylmer
Who Departed this Life, March 2nd, AD 1800
Aged 20 years

What was her fate ? Long Long before her hour,
Death called her tender soul, by break of bliss
From the first blossoms, to the buds of joy :
Those few our noxions fate unblasted leaves
In this inclement clime of human life.

[মাননীয়া রোজ হুইটওয়ার্থ এলমার-এর]
স্মৃতির উদ্দেশে
এ-জীবন থেকে যিনি বিদায় নিয়েছেন, ২ মার্চ ১৮০০ খ্রী.অ.
২০ বছর বয়সে
কী ছিল তাঁর বিধিলিপি ? সময়ের অনেক অনেক আগে
মৃত্যু হরে নিল তাঁর কোমল আত্মাকে, সুখাবেশ ভেঙে
প্রথম মুকুল থেকে আনন্দের কুঁড়িতে :
মানবজীবনের দুর্যোগের আবহাওয়ায় আমরা যারা
পড়ে আছি মন্দভাগ্য তাড়িত।

খুবই মর্মস্পর্শী সমাধিলিপি সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এই রোজ এলমার ?

রোজ এলমার কলকাতা এসেছিলেন তাঁর পিসী লেডি রাসেলের কাছে। বেড়াতে। আর ফিরে যান নি। সুপ্রিম

কোর্টে জজ স্যার হেনরি রাসেল-এর স্ত্রী লেডি রাসেল। এখন যে রাস্তার নাম রাসেল স্ট্রীট (রাস্তার নামকরণ হয়েছে স্যার হেনরির নামেই) সেখানে ছিল স্যার হেনরির বাড়ি।

রোজ এলমারের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে 'ক্যালকাটা গেজেট' লিখেছিল :

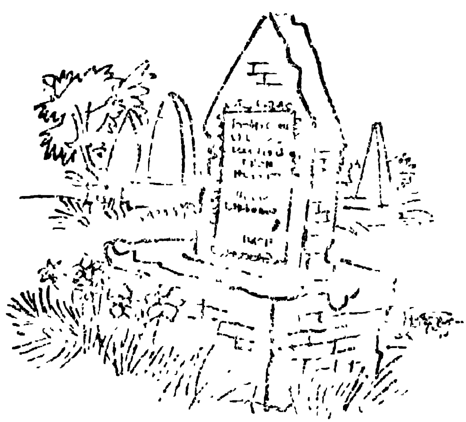
(রোজ এলমারের মৃত্যু হয়) "গত রবিবার তাঁর পিসেমশায় স্যার হেনরি রাসেলের বাড়িতে, প্রস্ফুটিত যৌবনে। এমন সব গুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি যা জীবনকে মধুময় করে, সমৃদ্ধ করে। (তাঁর মৃত্যুতে) পরিজনবর্গ মর্মাহত, সমাজ, যার তিনি ছিলেন উজ্জ্বল অলঙ্কার, শোকার্ত ..."

ভারতে আসার আগে কবি ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের সঙ্গে রোজের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়। ল্যাণ্ডর পরবর্তীকালে পয়লা সারির কবি এবং সুনিপুণ গদ্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রোজের অকাল মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ল্যাণ্ডর স্তম্ভিত হয়ে যান। ক'দিন বাক্যালাপ করেন না। তাঁর শোকার্ত মনের আকুতি একটি কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে :

Ah ! What avails the sceptred race ?
Ah ! What the form divine ?
What every virtue, every grace ?
Rose Aylmer, all were thine
Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep but never see.
A night of memories and of sighs
I consecrate to thee."

কী জানি, কত কথা বলতে চেয়েছিলেন কবি রোজকে, বলা হয় নি। সেই না-বলা কথার বদলে স্মৃতি আর দীর্ঘশ্বাসের রাত্রিকে কবি উৎসর্গ করেছেন রোজের স্মৃতির উদ্দেশে।

হয়তো দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানও একদিন লুপ্ত হবে, কিন্তু রোজের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ল্যাণ্ডরের এই কবিতায়।



লাটভবনে চুরি

রাজকোষ হতে চুরি হলে যে-কোনো একজনকে চোর হিসেবে ধরে আনতেই হয়—নইলে নগরপালের গর্দান থাকে না। আর এ-রকম ক্ষেত্রে সুবিচারের নামে অবিচার হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। কবি-কল্পনা নয়, ইতিহাসেও এ-ধরনের কাজীর বিচারের ভূরি ভূরি নজীর আছে।

কিন্তু অত ইতিহাস ঘাঁটার দরকার নেই। উপরের কথাগুলি যার সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে, এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৮৭১ সালে, এই কলকাতারই উপান্তে, ছোটোলাটের তৎকালীন বাসগৃহ বেলভেডিয়ার প্রাসাদে। ২৪-পরগণায় তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি. গ্রেহাম তাঁর Life in the Mafussil গ্রন্থে ঘটনাটির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা গল্পের চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক।

মিঃ গ্রেহাম লিখেছেন: ছোটোলাটের বাসগৃহ বেলভেডিয়ার প্রাসাদে ছোটোলাটের আত্মীয় ফিলিপস্ দম্পতি (এখানে ইচ্ছে

করেই ভুল নাম ব্যবহার করা হল) কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় শ্রীমতী ফিলিপসের একটি হীরক-অঙ্গুরীয় খোয়া গেল। যথারীতি এ সংবাদ পুলিশে জানানও হল। লাট প্রাসাদে চুরি। মহা সোরগোল বেধে গেল। প্রস্তাব এলো, গোয়েন্দা বিভাগের কোনো কনেস্টবলকে খিদমদগার হিসাবে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে রাখা হোক। সে দেখুক, এই চুরির কিছু কিনারা করতে পারে কি না।

সকলের সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল এক আয়ার উপর। ছদ্মবেশী কনেস্টবলটি আয়ার সঙ্গে দিব্যি প্রেম জমিয়ে তুললো।

কিছুদিন পরে, কনেস্টবলটি তার ওপরওয়ালা পুলিশ কমিশনারের কাছে একটি জবানবন্দী দিল। আর তারই ভিত্তিতে আয়াকে গ্রেপ্তার করা হল। ফরিয়াদী পক্ষের মামলা ছিল এই যে কনেস্টবলটি আয়ার চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে এবং আয়া নাকি তার কাছে স্বীকার করেছে আংটিটি সে-ই চুরি করেছে। এখন এটি সে বিক্রি করতে চায় কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে পেরে উঠছে না। যাই হোক মেয়েটি আংটি থেকে একটি হীরে খসিয়ে দিয়েছে। ছদ্মবেশী কনেস্টবলটি যদি এটি বিক্রি করে দিতে পারে তবে অপরটিও সে ওর কাছে বিক্রি করতে দেবে। এই কথা বলে আয়াটি ময়দানে একটি পূর্বনির্দিষ্ট গাছের তলায় কনেস্টবলটিকে হীরেটি দিয়েছে।

পূর্ব বর্ণিত সময় ও স্থানে মেয়েটি ও কনেস্টবলটিকে একত্রে দেখেছে এ-রকম সাক্ষী ছিল। হীরেটা আদালতে উপস্থিত করা হল। ফিলিপস দম্পতি সাক্ষ্য দিলেন, যতদূর মনে করতে

পারছেন, হীরেটা তাঁদের হৃত আঙটিরই। আত্মপক্ষ সমর্থনে মেয়েটি শুধু বললে, সে নির্দোষ। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য খণ্ডন করা গেল না। আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলাটির বিচার হল এবং আয়াটি ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। মেয়েটি কনেস্টবলের কাছে আপীল করল। কিন্তু আপীলেও দণ্ডাজ্ঞা বহাল রইল। হীরেটি ফিরিয়ে দেওয়া হল ফরিয়াদী পক্ষকে।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে ফিলিপস ও তদীয় পত্নী শ্রীরামপুর চলে যান। ফিলিপস ঐ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন। এখানে জিনিষপত্র খোলাখুলি করতে গিয়ে দেখা গেল হৃত আঙটিটি দোয়াতদানির মধ্যে রয়েছে এবং তার হীরেগুলি অক্ষতই আছে। ফিলিপস আঙটিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সুপারিশ করলাম আয়াকে মার্জনা করা হোক। কিন্তু ব্রামস্টোন বললেন, সম্পূর্ণ আইন-সম্মতভাবে আয়াকে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এমনও তো হতে পারে আয়ার আত্মীয়-স্বজনেরা অন্য আর একটি হীরে আঙটিটিতে বসিয়ে দিয়েছে এবং আয়া এটি দোয়াতদানির মধ্যে গুঁজে দিয়েছে—আইনের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে।

শ্রীমতী ফিলিপসের ইতিমধ্যে মনে পড়ে গেছে, যেদিন সন্ধ্যায় আঙটিটি খোয়া যায়, ছোটোলাটের কনিষ্ঠ কন্যাটি তাদের কামরায় এসে খেলা করছিল এবং সে-ই সম্ভবত দোয়াতদানীর মধ্যে আঙটিটি গুঁজে দিয়ে থাকবে। দোয়াতদানিটা এখানে খোলা হয়েছিল কিনা, মহিলা অবশ্য তা নিশ্চয় করে বলতে



পারলেন না। আর তাই তাঁর একথা কোনো কাজে লাগল না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হল। আয়াটি মুক্তি পেল।

উদ্বৃত্ত হীরেটি আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। সমস্যা দাঁড়াল ওটির কি হবে।

মিথ্যে সাক্ষ্য দেবার অভিযোগে কনেস্টবলটিকে গ্রেপ্তার করা হল। আমার মনে হল, পুলিশই সম্ভবত মিথ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাজিয়েছে এবং চুরির দায়ে কাউকে দণ্ড দিয়ে বাহাদুরী নেবার লোভে হীরেটা খরিদ করেছে যার বাজার দর মাত্র ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং। কনেস্টবলটি কিন্তু আদালতে তার পুরনো কাহিনী আঁকড়ে থাকল।

এর কিছুকাল পরে শ্রীমতী ফিলিপস আমাকে একটি লকেট দেখালেন। লকেটটি থেকে একটি হীরে খোয়া গেছে। উদ্বৃত্ত

হীরেটি দেখলাম ঐ জায়গায় খাপে খাপে বসে যায়। সবাই বললে আয়াই লকেটটি থেকে হীরেখানা খুলে নিয়েছে এবং কনেস্টবল কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই করে নেবার জন্য আঙটিটি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে খুচরো হীরেটি তাকে দিয়েছিল। তারপর এত সব কাণ্ড ঘটায় আয়া আঙটিটি তার বন্ধুদের দেয় এবং পূর্ববর্ণিতভাবে তারা এটি দোয়াতদানির মধ্যে গুঁজে দেয়।

আমি লকেট ও আঙটিটি এক মণিকারের দোকানে নিয়ে গেলাম। তারা বললে লকেটের হীরে এবং উদ্বৃত্ত হীরেটি একই জাতের। তবে ঐ হীরেটি যে লকেটটি থেকেই খুলে নেওয়া হয়েছে এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেননা, ঐ রকম আরও হাজারটা হীরে আধ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন লোক বড়োবাজার থেকে কিনে আনতে পারে। এমত অবস্থায় এ নিয়ে আর উচ্চ-বাচ্য না করাই স্থির হয়। আসল ঘটনাটা যে কি তা এখনো রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

যতদূর জানা আছে, এ রহস্যের কিনারা কোনোদিনই আর হয়নি।

একটি চোরবাজারের কাহিনী

বৌবাজার-সার্কুলার রোডের মোড়ে প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে পুরনো জিনিসপত্রের একটা বাজার এখনও আছে, যার নাম চোরাবাজার। হয়তো এককালে এখানে চোরাইমাল বিক্রি হতো কিংবা হয়তো লোকের ধারণা ছিল এই বাজারে যা বিক্রি হয় তা সবই চোরাই মাল। আমরা এখানে যে চোরাহাটের কথা বলছি সেটা কিন্তু অন্য আর একটি বাজার। এখন আর তার অস্তিত্ব নেই।

এই বাজারটিও ছিল বৌবাজারে। বৌবাজার স্ট্রীট (এখন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) আর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের (এখন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট) সংযোগস্থলের কাছাকাছি। তবে এই বাজারটিও বড় রাস্তা থেকে দেখা যেত না। যেতে হতো গৌর দে লেন দিয়ে। গৌর দে লেন রাস্তাটি ঐ নামেই এখনও আছে। বেরিয়েছে হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকে।

এই শতকের গোড়ার দিকে এক ভদ্রলোক স্থানীয় অধিবাসী-

দের সুবিধার জন্য স্থাপন করেছিলেন বাজারটি। নাম কালিদাস শীলের বাজার। বাজারটি কিন্তু জমল না। সবজী-ওয়ালারা, ফলমূলের ব্যাপারীরা মাংস বিক্রেতারা একে একে হাওয়া হয়ে গেল। একে একে তাদের জায়গায় এসে জুটল পুরনো জিনিসপত্রের ব্যাপারীরা, আর সচরাচর এসব ক্ষেত্রে যা হয় চোরাই মালের থৌলতদারেরা। বাজারটা হয়ে উঠল চোর-বদমায়েস-পকেটমারদের আড্ডা। সারাদিন বাজারটা খা খা করছে খালি, রাত হলেই জমজমাট। আর এইভাবেই কালিদাস শীলের বাজারের নতুন নাম হল চোর হাট বা চোরেদের বাজার।

এই বাজারে অগস্টাস সমারভিল নামে এক ভদ্রলোকের কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস বিলিফ্‌স ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে সেই অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন বেশ রসিয়ে।

সমরভিল সাহেব এই বাজার থেকে একজোড়া জুতো কিনেছিলেন পাঁচ টাকা দিয়ে। তাঁর চোখের সামনেই দোকানদার জুতোজোড়া একটা পিচবোর্ডের বাক্সে প্যাক করে দিল। টোন সুতো দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল, যাতে বাক্স থেকে জুতোজোড়া পড়ে না যায়। সাহেব জুতোর বাক্স বগলদাবা করে গেলেন অন্য আর এক দোকানে। সেখানে দরদস্তুরে বনল না। ফিরে গেলেন বাড়ি। বাড়ি গিয়ে বাক্স খুলে দেখেন ভোঁ ভোঁ—কোথায় জুতো। অথচ সুতোর বাঁধন রয়েছে অটুট। বাক্সটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা

গেল, এক পাশের পিচবোর্ড কেটে জুতো জোড়া বার করে নিয়ে কাটা অংশটা ফের জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সুতোটা একটুও এদিক ওদিক হয়নি।

পরদিন সন্ধেয় ভদ্রলোক ফের গিয়ে হাজির হলেন চোর হাটে এবং সোজা সেই দোকানে। দোকানদার একগাল হেসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। আসুন, আসুন, আপনি আবার এসেছেন। তার মানে আপনি আমার পুরনো খদ্দের হলেন। এই নিন আরেক জোড়া জুতো, মাত্র তিন টাকা। একেবারে জলের দাম।

ভদ্রলোক লিখেছেন : একবার ভেবে দেখুন আমার অবস্থা! জুতো জোড়া হাতে নিয়ে দেখি, এ আমার সেই খোয়া-যাওয়া জুতো জোড়াই! আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না। তিনটে টাকা বের করে দিয়ে জুতো জোড়া নিয়ে নিলাম। কিন্তু এবারে আর কোনো ঝুঁকি নিলাম না। নতুন জোড়া পায়ে গলিয়ে নিলাম আর পুরনো জোড়া হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

ভদ্রলোকের বোধ হয় মজা লেগেছিল। প্রায়ই সন্ধেবেলা ঐ বাজারে ঘুরতেন। একদিন চোখে পড়ল একটা দোকানে ঐ বাজারের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা বোর্ড—'এক দর'। ভদ্রলোক গুটি গুটি এলেন, নতুন একটা ইলেকট্রিক সুইচ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত দাম?

দোকানের কাউন্টারে ছিল একটা বাচ্চা ছেলে। সে ভিতরে ঢুকে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধ মুসলমান। বৃদ্ধ জবাব দিলেন, বারো আনা। আর

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই সে একগাল হেসে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল দোকানে ঝোলানো বোর্ডটি : 'এক দর'।

সমরভিল লিখেছেন, বৃদ্ধকে দেখে মনে হল এর সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে। তারপর প্রায়ই আসেন বৃদ্ধের দোকানে বাতচিত করেন। একটু একটু করে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বৃদ্ধের কাছ থেকে প্রাচ্য দেশের অপরাধ জগতের অনেক খবর পান। শেষে একদিন বৃদ্ধকে বলেন তাঁর জুতো কেনা, খোয়া যাওয়া আবার সেই জুতোই নতুন করে কেনার গল্পটি। বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসছিলেন, প্রশ্রয়ের হাসি। সাহেবের কথা শেষ হলে বৃদ্ধ বললেন তাঁর নিজের বিচিত্র কাহিনী। বৃদ্ধের নিজের কথাতেই শোনা যাক সে গল্প।

"যখন ছোকরা ছিলাম তখন লোকে আমাকে বলতো দিল্লির সবচেয়ে চতুর চোর। এ-নিয়ে আমার একটু অহংকারও ছিল। চুরিবিদ্যায় আমার জন্মগত প্রতিভা ছিল। অবশ্য আমার বাবা ছিলেন আরো বড়ো।"

"এখনও কি বিদ্যেটা কাজে লাগান নাকি?" সমরভিল কৌতূহল চাপতে পারেন না।

বৃদ্ধ ঘৃণাভরে পিচ করে থুতু ফেলল মাটিতে। "হতচ্ছাড়া বৃটিশ রাজ! সব ভেস্তে দিল। এককালে কত পয়সা ছিল আমার! এখন উদয়াস্ত মেহনত করেও পেট ভরে না।" তাঁর চোখের দৃষ্টি ঘৃণাভরে তাঁর ছোট্ট দোকানটি প্রদক্ষিণ করল। "আমি বলছিলাম ছেলেবেলার কথা"।

"তখন আমার বয়স বছর বারো হবে। আমার কিছু

টাকার দরকার হলো। বেশী নয়, দুটো মাত্র টাকা। কিন্তু বাবা দিল না টাকাটা। আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। চোখে পড়ল, বাবা একটা থলিতে কিছু টাকা রেখে কোমরের কষিতে বেঁধে নিলেন। সন্ধে হলো। সব ধার্মিক মুসলমানের মতোই মক্কার দিকে মুখ করে নমাজ পড়তে বসলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে নমাজ পড়ছি। বাবা যখন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে মাটি চুম্বন করছেন আমি তখন নিমেষের মধ্যে আমার কোমরে গোঁজা ছুরিটা বের করে লুঙ্গির খুট থেকে টাকার থলিটা কেটে নিলাম। বাবা যেমন প্রার্থনা করছিলেন, তেমনি করতে থাকলেন। নমাজ শেষ হলে সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, 'বেটা তুই দুটো টাকা চেয়েছিলি না? এই নে।' চেয়ে দেখি, যে থলিটা একটু আগে আমি বাবার লুঙ্গির খুট কেটে নিয়েছিলাম সেই থলিটা থেকেই দুটো টাকা বের করে দিচ্ছেন আমাকে। বিস্মিত হয়ে পকেটে হাত দিলাম, থলিটা নেই। বাবা আমার অবস্থা দেখে একটু হাসলেন : জিতা রহো বেটা! ফিক্‌র মাত করো। একেবারে আনাড়ি হিসেবে হাত সাফাই ভালোই করেছিস। ঠিক আছে কাল থেকে কাজ শিখবি তুই।

পরদিন সকালে অনেক অন্ধকার আর বদবু ওয়ালা গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন চাঁদনী চক। সেখানে ছোটো একটা কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তুরন্ত তিনবার টোকা মারলেন। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল এক বৃদ্ধার মুখ। বাবাকে দেখে বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটল কিন্তু আমাকে

দেখে কুঁচকে গেল ভ্রূ। বাবা তার কানে কানে কি বললেন। মনে হলো বৃদ্ধার সন্দেহ তাতে কাটল। আমাদের সে অনুসরণ করতে বলল। অন্ধকার গুমোট একটা গলিপথ দিয়ে একটা বড় হল ঘরে এসে পড়লাম আমরা। ঘরের মধ্যে নানা ধরনের জামা আর বিচিত্র সব জিনিস ঝুলছে। এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। যথারীতি সম্ভাষণ বিনিময় হবার পর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, কী মতলবে আমরা এসেছি? বাবা বললেন, আমার বেটার এলেম আছে। একটু বাজিয়ে দেখুন।

বৃদ্ধ হাততালি দিতেই একটা ছোকরা এসে হাজির। কোনো কথা না বলে বৃদ্ধ একটা টাকা বের করে ছোকরার হাতে দিল। ছোকরা সে টাকাটা রাখল আমার সামনে যে কামিজটা ঝুলছিল তার পকেটে। বাবা ফিস ফিস করে আমাকে বললেন, ঐ টাকাটা বার করে নিতে হবে কিন্তু দেখিস কামিজটা যেন একটুও না নড়ে। এত সহজ কাজ! আমি একটু উপেক্ষার হাসি হেসে হাত ঢুকিয়ে দিলাম জেবে। আর যে মূহূর্তে আমার আঙুলটা গিয়ে ঠেকল টাকাতে অমনি হাজারটা লুকোনো ঘন্টি বেজে উঠল। আবার চেষ্টা করলাম, এবারে আরো সন্তর্পণে। কিন্তু এবারেও সেই একই কাণ্ড। বারবার তিনবার। কিন্তু প্রত্যেকবারই সেই একই ব্যাপার। বৃদ্ধের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে বলল, আহ্‌মদ উসকো দেখ্‌লা দো! ছোকরা বুক ফুলিয়ে এলো আমার দিকে। ওর হাতটা এক লহমা কামিজটার কাছে স্থির হয়ে থাকল। তারপরই দেখি ওর হাতের চেটোয় সেই টাকাটা। আমি তো থ। পরে



কিন্তু আমি আহ্‌মদকে এ-সব হাতসাফাইয়ের খেলায় হারিয়ে দিয়েছিলাম। যতবারই বাজী, হয়েছে, জিতেছি আমি। এই মক্তবেই আমার তালিম, পকেটমারা, সিন্ধুকভাঙা, সবরকম তালার চাবি তৈরির মহাবিদ্যায়। যে কবছর বাবার সঙ্গে এই পেশায় ছিলাম আমরা টাকায় গড়াগড়ি দিয়েছি। কিন্তু আমার নসিবে সইল না এত সুখ।

আমার সাহস খুবই বেড়ে গিয়েছিল। আমি খোদ পুলিস সুপারের বাংলোতেই ঢুকে পড়লাম একদিন। সিন্ধুক মুহূর্তের মধ্যেই খুলে ফেললাম। কিন্তু অসাবধানে টেবিলের উপরে রাখা একটা ফুলদানী পড়ে গেল। ফিরিঙ্গি কুত্তাটার ঘুম

ছিল পাতলা। আমি একলাফে. জানালায়। কিন্তু তার আগেই একটা বিদ্যুতের ঝলক আর হাতের চেটোয় অসহ্য ব্যথা। রক্তপাতে দুর্বল, টলতে টলতে যখন বাড়ি ফিরলাম, হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার খেল খতম। এ-হাত নিয়ে আর কিছু করা যাবে না। বাঁ হাত দিয়ে কাজ করার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাঁ হাত কি চলে ডান হাতের মতো। কি আর করি। বিড়াল তপস্বী হয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করছি ব্যবসা করে।"

বৃদ্ধ চুপ করল, স্মৃতিভারাতুর, হারিয়ে যাওয়া যৌবনের কথা মনে করে। আমি উঠলাম।

"কি আবদুল, একটা সিগ্রেট চলবে নাকি ?"

আবদুল মাথা নাড়ল, চলবে। পকেটে হাত দিয়ে দেখি কোথায় সিগারেট কেস। এ-পকেট সে-পকেট সব পকেট হাতড়ে দেখি। সব পকেটই খালি। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ফেনিয়ে উঠল। কঠোরভাবে বললাম, 'আবদুল'। বৃদ্ধ একটু মুচকি হেসে বললে, ভয় নেই সাব। সব আপনার পিছনের চেয়ারের উপরেই পাবেন। দেখলেন তো সাব, আমার হাতের কৌশল এখনও আমাকে ছেড়ে যায় নি।

আমি নীরবে জিনিসগুলো পকেটস্থ করে চলে গেলাম। বিস্ময়ে এমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে একটাও কথা বেরোল না মুখ দিয়ে।

ছবি, শুধ্ পটে লিখা

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে কে না গেছেন। দোতলার চিত্রশালাটিও অনেকেই হয়তো ঘুরে দেখেছেন। পাশাপাশি ছবি দুখানাও চোখে না পড়বার কথা নয়, কিন্তু ছবি দুটির সঙ্গে সেকালের যে মিলনান্ত অথচ বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনীটি জড়িয়ে আছে—কজনের তা মনে পড়েছে?

আমি জোফানির আঁকা তেল রঙের ছবি দুখানির কথা বলছি। একটি হেস্টিংস ও তদীয় পত্নীর, অন্যটি হেস্টিংস-পত্নীর একক আলেখ্য। প্রথমা পত্নীর নয়, দ্বিতীয়া পত্নীর। ছবির পরিচিতিতে তার উল্লেখ আছে। ভদ্রমহিলার নাম মারিয়া অ্যান, হেস্টিংস আদর করে ডাকতেন মারিয়ান, ভালোবেসে মারিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন হেস্টিংস।

মিলনান্ত অথচ বিয়োগান্ত কথাটা হয়তো সোনার পাথরের বাটির মতো শোনাচ্ছে।—তবু কথাটা সত্য। কেননা, হেস্টিংসের পক্ষে যে প্রেম ছিল মিলনান্ত, আর একজনের জীবনে তা

ফেলেছিল বিচ্ছেদের ছায়া। হাঁ, মারিয়ার প্রথম স্বামীর কথাই বলছি। তাঁর নাম ছিল ব্যারন ইমহফ। জাতিতে জার্মান। বেচারা ইমহফ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ছবি এঁকে দুটো পয়সা করতে।

ইমহফ ব্যারন ছিলেন নামেই। পয়সা-কড়ি খুব একটা ছিল না তাঁর। এককালে জার্মানীতে সৈন্যবিভাগে কাজ করতেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে সস্ত্রীক ইমহফ ইংলণ্ডে আসেন ভাগ্যের সন্ধানে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণা সুলভ নয়। ইংলণ্ডে এসে হাড়ির হাল ইমহফদের।

তখন ভারতবর্ষ ছিল ভাগ্যান্বেষীদের মৃগয়াক্ষেত্র। ইমহফ ভাবলেন, কোনো রকমে একবার ভারতবর্ষে পৌঁছতে পারলেই হয়—ছবি এঁকেই ভাগ্যদেবীর মন জয় করা যাবে।

তখনকার দিনে ভারতে আসার সহজ উপায় ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নেওয়া। তাই করলেন ইমহফ—সমর বিভাগে ক্যাডেটের চাকরি নিলেন একটা। তারপর অনেক তদ্বির-তদারক করে একটি পুত্র ও স্ত্রীসহ ভারত যাত্রার অনুমতি পেলেন।

১৭৬৯ সালে মার্চ মাসে ডিউক অব গ্রাফটন জাহাজযোগে ভারত অভিমুখে রওনা হলেন ইমহফ পরিবার।

তখন ইংলণ্ড থেকে ভারতে আসতে সময় লাগত ছ'মাস। এই ছ'মাসে এমন সব কাণ্ড ঘটল, মেকলের ভাষায়—যা একখানি উপন্যাসের উপাদান হতে পারে।

হেস্টিংস ঐ একই জাহাজে মাদ্রাজ আসছিলেন। সেই তাঁর

দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসা। প্রথমবার তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৭৫০ সালে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজ নিয়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো। বিয়ে করেছিলেন ১৭৫৬ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর পত্নী-বিয়োগ ঘটে। দেশে ফিরে যান ১৭৬৪ সালে। কিন্তু সে সময় যে যৎসামান্য বিত্ত তিনি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। পুনরায় কোম্পানির শরণ নিতে হয় তাঁকে। কোম্পানি হেস্টিংসের উপর সদয় ছিল। বেশ বড় চাকরিই পেলেন তিনি, মাদ্রাজে কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন।

পারিবারিক কোন বন্ধন ছিল না হেস্টিংসের, আর শ্রীমতী ইমহফের ছিল না স্বামীর প্রতি কোনো ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা। অসামান্য রূপ ছিল শ্রীমতী ইমহফের, আর তার চেয়েও বেশী ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বিধাতার চক্রান্তে একই জাহাজের ডেকে এমন দুজন মানুষের যদি দেখা হয়, তাহলে কি অনর্থ না ঘটে পারে!

মেকলে লিখেছেন, "ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বা মারাত্মক শত্রুতা গড়ে ওঠার পক্ষে ভারতগামী জাহাজের চেয়ে প্রশস্ত আর কিছুই নেই।" এখানে পরস্পরকে এড়িয়ে চলার উপায় নেই—নানাসূত্রে একের সঙ্গে অপরের দেখা হবেই। আর ছ'মাস এইরূপ বাধ্যতামূলক দেখাসাক্ষাতের ফলে একের প্রতি অপরের হয় জন্মাবে আকর্ষণ নয়তো বিতৃষ্ণা—এইটেই স্বাভাবিক।

তদুপরি জাহাজে হেস্টিংস অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীমতী ইমহফ নিজ হাতে তুলে নিলেন তাঁর সেবার ভার। প্রাণ



ঢেলে সেবা করলেন। নিজের হাতে ওষুধ দিতেন হেস্টিংসকে, তাঁর মাথার কাছে বসে থাকতেন সারাক্ষণ। ফলে যা হবার তাই হলো। জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছবার আগেই দু'জন দুজনের প্রেমে তলিয়ে গেলেন।

মাদ্রাজে ইমহফ-দম্পতি হেস্টিংসের অতিথি হলেন। নতুন কাউন্সিল সদস্যের অতিথি। লোকে তাঁদের সমীহ করে চলত। হেস্টিংসের পরিচয়-পত্রের জোরে কিছু কিছু পোর্ট্রেট আঁকার কাজও পেতে লাগলেন ইমহফ।

এদিকে হেস্টিংস-মারিয়ানের প্রেমও লোকচক্ষুর অগোচর

থাকছিল না। তাঁদের জড়িয়ে নানা রকম গুজব রটতে লাগল। ব্যারন ইমহফ খুব একটা আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন না। তবু অবস্থাটা বোধ হয় তাঁর পক্ষেও অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৭০ সালের শেষ দিকে তিনি ক্যাডেটের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতা এলেন। শ্রীমতী অবশ্য রয়ে গেলেন মাদ্রাজেই। কেননা, শ্রীমতীকে কলকাতা নিয়ে যাবার মতো সঙ্গতি ছিল না ইমহফের।

হেস্টিংসের চিঠির জোরে কলকাতাতেও কিছু কিছু কাজ পেতে থাকলেন ইমহফ। পয়সা হল কিছু। তখন চিঠির পর চিঠি লিখে মারিয়াকে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৭১ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীমতী কলকাতা এলেনও। কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ। অল্পকালের মধ্যেই হেস্টিংস কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের গবর্নর নিযুক্ত হলেন। তিনি কলকাতা এসে পৌঁছলেন ১৭৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

এদিকে ইমহফের মতো যাঁরা কোনো একটা চাকরি জুটিয়ে এদেশে এসে অন্য ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কোম্পানি তাঁদের অবিলম্বে দেশে ফেরার আদেশ দিলেন। বেচারা ইমহফ কি আর করেন—প্রথমে পুত্রটিকে ।পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে (১৭৭৩) নিজেও রওনা হলেন ইংলণ্ড অভিমুখে। মারিয়া রয়ে গেলেন কলকাতাতেই।

ছবি এঁকে দুটো পয়সা করবেন বলে এদেশে এসেছিলেন

ইমহফ, কিন্তু একেবারে সর্বহারা হয়ে ফিরতে হল তাঁকে।

মেকলে অবশ্য লিখেছেন, ব্যারনের সম্মতিক্রমেই নাকি সব ব্যাপারটা ঘটেছিল। তিনজনে পরামর্শ করে নাকি স্থির হয়েছিল, ব্যারন তাঁর পত্নীকে ডিভোর্স করবেন আর তার পরিবর্তে হেস্টিংস ব্যারনের প্রতি উদারহস্তে কিছু কৃপা বর্ষণ করবেন। হেস্টিংস তাঁর কথা রেখেছিলেন। ব্যারন নাকি স্যাকসনিতে জমিদারী কিনবার মতো বিত্ত নিয়ে এদেশ পরিত্যাগ করেছিলেন।

সে যাই হোক, ব্যারনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর খুব ঘটা করেই মারিয়াকে বিয়ে করেন (১৭৭৭) হেস্টিংস। কলকাতার গবর্নমেণ্ট হাউসে এতদুপলক্ষে যে উৎসব হয় তাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই যোগ দিয়েছিলেন।

বিয়ে হয়েছিল সেণ্ট জনস্ চার্চে। চার্চ রেজিস্টারে সে-বিয়ের বিবরণ আছে।

হেস্টিংস মারিয়াকে সত্যিই ভালোবেসেছিলেন, আর মারিয়াও হাসিমুখে তাঁর সুখদুঃখের ভাগ নিতেন। মারিয়ার উদ্দেশে এক খাতা বোঝাই প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন হেস্টিংস।

মারিয়া প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। হেস্টিংসের উপর ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি। তাই হেস্টিংসকে খুশী করার জন্য অনেকেই চাইত মারিয়াকে খুশী করতে। আর এর সুযোগ নিয়ে মারিয়া প্রচুর অর্থাদি উপঢৌকন (মেকলের মতে, হেস্টিংসের অজ্ঞাতে) আদায় করতেন।

অসুস্থতার জন্য হেস্টিংসের আগেই মারিয়াকে ইংলণ্ড ফিরতে

হয়। তখন তিনি নাকি এত ধনসম্পদ নিয়ে ফিরেছিলেন, যা কোনো রানীরও ঈর্ষার বস্তু।

বিলেতগামী জাহাজের যে কামরাটি শ্রীমতী ইমহফের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, তা নাকি চন্দনকাঠ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন হেস্টিংস। শ্রীমতীর সমুদ্রযাত্রা যাতে আনন্দময় হয় তার জন্য নাকি বহু অর্থব্যয় করে জোগাড় করে দিয়েছিলেন কয়েকজন মনমত সঙ্গিনী।

এখন ইতিহাসের সেই পৃষ্ঠায় ধুলো জমেছে। সে কাহিনী কারো মনে পড়বার কথা নয়। আর তা ছাড়া ছবি তো শুধুই ছবি, শুধু পটে লিখা।

কলকাতার পথ-ঘাট : পুরনো দিনের স্মৃতি

সহর কলকাতার রাস্তাঘাটের নাম প্রতিদিন পাল্টানো এখনকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা হয়তো অনিবার্য। ইংরেজ আমলে রাজপুরুষদের নামে রাস্তার নামকরণ হতো। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সে-সব নাম অনেকেরই ভালো না-লাগার কথা। অতএব এ নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। তবে সর্বক্ষেত্রেই রাজপুরুষদের নামাঙ্কিত রাস্তারই যে নতুন নামকরণ হচ্ছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এমন সব রাস্তারও নাম বদলানো হচ্ছে যার সঙ্গে কলকাতার আদি ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর ফলে কলকাতার আদি ইতিহাসের অনেক স্মারক চিহ্ন হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক, বৌবাজার স্ট্রীট। মানুষের মুখে মুখে এই নামটি এখনও চললেও এই রাস্তার সরকারী নাম এখন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী একজন নমস্য ব্যক্তি। বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, অকৃতদার, অজাতশত্রু—তাঁর মতো মানুষ বিরলসংখ্য। তাঁর

নামে কি অন্য কোনো রাস্তার নাম করা যেত না? বৌবাজার নামটা তো কোনো ইংরেজ রাজপুরুষের নাম নয়।

বৌবাজার কলকাতার সবচেয়ে পুরনো রাজপথের অন্যতম। এক সময় একে বলা হত অ্যাভিনিউ। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছিল পুরনো কেল্লার সামনে। পুরনো কেল্লার কোনো চিহ্নই এখন আর নেই। কলকাতার প্রথম ট্রাম লাইন বসেছিল এই রাস্তায়।

বৌবাজার নাম নাকি হিন্দী বহুবাজারের অপভ্রংশ। এখানে তখনকার দিনেও ছিল একটি বর্ধিষ্ণু বাজার। বহু রকমের জিনিস পাওয়া যেত। তাই থেকে এই বহুবাজার এবং শেষ পর্যন্ত লোকমুখে বৌবাজার। ধর্মতলা বাজারের মতোই নাকি বড়ো ছিল বৌবাজার। এককালে অঞ্চলটি বৈঠকখানা নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল একটি ঝুপরি বটগাছ। ব্যাপারীরা এখানে বসে বিশ্রাম করত, এখানে বর্গীর উৎপাত ছিল না বলে। ১৭৯৪ সালে আপজন কলকাতার যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাতে 'ব্রেড অ্যাণ্ড চীজ' বাংলোর কাছে এই গাছটির অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়েছিল। অনেকের ধারণা এই গাছের তলায় বসেই হুঁকো খেতে খেতে যোব চার্নক সাহেব ব্যাপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা অবশ্য বলেছেন চার্নক সাহেবের 'বৈঠকখানা' ছিল নিমতলা অঞ্চল।

এখন যার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (সার্কুলার রোড) তখন সেটা ছিল মারহাট্টা ডিচ। বর্গীর উৎপাত থেকে

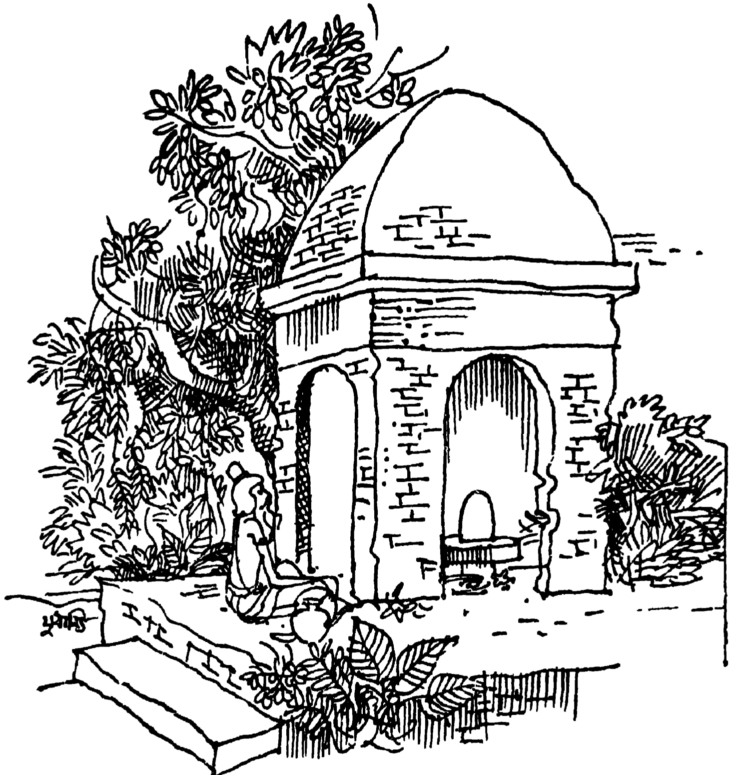
কলকাতাকে বাঁচাবার জন্য এই চক্রবেড় খাল কাটার পরিকল্পনা হয়েছিল। এই মারহাট্টা ডিচ আর বৌবাজারের সংযোগস্থলে ছিল এই বিখ্যাত গাছটি। মারহাট্টা ডিচ বুজিয়ে ফেলে যখন সার্কুলার রোড হয় তখন গাছটি কাটা পড়ে।

গাছটি যখন কাটা হয় তখন দেশীয়দের মধ্যে কিছু বিক্ষোভের গুঞ্জন শোনা যায়। দেশীয়রা নাকি গাছটিকে পবিত্র বলে মনে করতেন। তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড মরনিংটন গাছটিকে বাঁচাবার জন্য নির্দেশও দিয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই দেখা গেল গাছ কাটা হয়ে গেছে। সিরাজ-উদ্-দৌলা তাঁর কলকাতা অভিযানের সময় নাকি এই গাছের নিচে বসে লড়াই দেখেছিলেন। দেশীয়দের ভক্তির কারণ নাকি সেইটেই।

বৈঠকখানা নামে বাজার এবং ঐ নামের রাস্তা এখনও আছে। বৌবাজার নামটা না বদলালে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত জানি না।

চৌরঙ্গী রোডের বড়ো অংশটার নাম এখন জওহরলাল নেহরু রোড। কলকাতার এই মর্মকেন্দ্রটি এককালে ছিল জনবিরল, জঙ্গলাকীর্ণ একটি অঞ্চল। রাস্তার নাম বদলালেও এলাকাটা এখনও চৌরঙ্গী নামেই পরিচিত।

এখন যেটা গড়ের মাঠ, এককালে সেটা ছিল সুঁদুরীগাছের জঙ্গল। মাঝে মাঝে খালবিল, জলা জমি। সুন্দরবনের মতোই। বোধ হয় এককালে সুন্দরবনেরই অংশ ছিল এই জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্য দিয়েই শহরের উত্তরাঞ্চল থেকে ভবানীপুর হয়ে কালীতীর্থ কালীঘাটে যাবার পায়ে চলার



তীর্থপথ। তারই নাম চৌরঙ্গী। নামের একটু ইতিহাস আছে। আর এই ইতিহাস নিয়েও আছে নানা মুনীর নানা মত। সবচেয়ে চলিত যেটা তাই বলছি। এখানে থাকতেন এক সাধু, শিবের উপাসক, নাম জঙ্গল গির চৌরঙ্গী। তিনি ছিলেন এক ধর্মসম্প্রদায়ের গুরু। অনেক ছিল তাঁর শিষ্য-সামন্ত। গোবিন্দপুর নালা, এখন যা টলির নালা বা আদিগঙ্গা নামে পরিচিত, তার তীরে ছিল একটা প্রাচীন শিব মন্দির।

জঙ্গল গির এই মন্দিরে পূজা-উপাসনা করতেন। মন্দিরটি এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।

চৌরঙ্গী এই তীর্থ পথটির দেখাশোনা করতেন। যাত্রীদেরও তিনি ছিলেন সহায়। তাঁরই নামে রাস্তাটির নাম।

ইংরেজরা কলকাতায় থিতু হয়ে বসবার পর শহর ক্রমশ বড়ো হতে থাকে। জ্বালানীর প্রয়োজনে কাটা হতে থাকে জঙ্গল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হবার পর কলকাতার নগরায়ণ হতে থাকে অতিদ্রুত। নতুন ফোর্ট উইলিয়ম তৈরি হয় গোবিন্দপুর গ্রামে। আর তার চারপাশের পতিত জমি হয় এসপ্লানেড। ১৭৫৭ সালে ওখান থেকে গ্রাম তুলে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। বাকী জঙ্গল সাফ করে হয় কলকাতা ময়দান, গড়ের মাঠ।

এককালে কলকাতায় খুব বাগান-বাড়ি তৈরির হিড়িক পড়েছিল। চৌরঙ্গীতে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন শুরু হয় তখনই। শহর কলকাতা তখন ছিল অস্বাস্থ্যকর আর গরম। সাহেব-সুবোদের অনেকে তাই এখানে এলে অনেক জায়গা নিয়ে বাগান-ঘেরা বাড়ি তৈরি করেছিল। চৌরঙ্গী, আগেই বলেছি, তখন ছিল শহরের বাইরে। ঐ অঞ্চলে যেতে পালকি-বেহারারা দ্বিগুণ ভাড়া চাইত। চাকর-বাকরেরা যখন রাত্রে ঐ অঞ্চল থেকে ফিরতো তখন তারা ভালো জামাকাপড় সব খুলে রেখে আসতো। কেননা ঐ অঞ্চলে চোর-ডাকাতের অসম্ভব প্রাদুর্ভাব ছিল। লোকে চলাফেরা করতো দলবদ্ধভাবে।

গোড়ার যুগে চৌরঙ্গীতে মাত্র দুটি বাড়ি ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের। পরে এই বাড়িতে খ্রীস্টান নানদের আবাস হয়। বাড়ির চারপাশে বিরাট বাগান ছিল। রাত্রে সিপাহীরা বাড়িটি পাহারা দিত এবং ডাকাত তাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করত। পরে স্যার এলিজা উঠে যান এখন যেখানে লোরেটো হাউস সেখানে এক বিরাট বাড়িতে। আর সেই বাড়ির উদ্যান থেকেই যে বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড পার্ক স্ট্রীট তা তো এই বইয়েরই অন্যত্র বলেছি।

চৌরঙ্গী এলাকায় পুরোদমে বাড়ি তৈরি শুরু হয় আঠারো শতকের শেষের দিকে। আপজনের ১৭৯৪ সালের ম্যাপ থেকে জানা যায় ধর্মতলা, বির্জিতলা এবং সার্কুলার রোডের মধ্যে চৌরঙ্গী এলাকায় ২৪টি বাড়ি ছিল।

একজন বাঙালী লেখকের মতে চৌরঙ্গী নামের ব্যুৎপত্তি একটু অন্য। চৌরঙ্গীর বাড়িগুলো থেকে দেখা যেত নানা রঙবেরঙের দৃশ্য। হিন্দীতে চৌরিঙ্গী কথাটির অর্থ তা-ই। এই চৌরিঙ্গীরই অপভ্রংশ চৌরঙ্গী।

ধর্মতলা এখন লেনিন সরনি। এই রাস্তাটিও কলকাতার সবচেয়ে পুরনো রাস্তাগুলির একটি। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত এইচ. ই. এ কটনের 'ক্যালকাটা ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' গ্রন্থে লেখা হয়েছে "গত শতকেই ধর্মতলাকে বেশ উঁচু একটা রাজপথ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দু'পাশের পরিখাগুলিকে গভীর করে রাস্তাটিকে উঁচু করা হয়…।" ১৭৫৬-৫৭ সালের

কলকাতার মানচিত্রে অবশ্য ধর্মতলার কোনো উল্লেখ নেই, যদিও ঐ মানচিত্রে জানবাজার ও ডিঙাভাঙার উল্লেখ আছে। সি এস. হিলের 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬' গ্রন্থে এই মানচিত্রটি মুদ্রিত হয়েছে।

আঠেরো শতকের শেষের দিকেই যে ধর্মতলা অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল তাতে সন্দেহ নেই, যদিও হয়তো ধর্মতলা স্ট্রীট আরও কিছুকাল পরে তৈরি হয়েছে। বলতে কি, যখন চৌরঙ্গী ছিল গোবিন্দপুর গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলার পথ, তখনও ধর্মতলার অস্তিত্ব ছিল।

ধর্মতলা তখন ছিল শহর থেকে লবন হ্রদ এবং সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে যাবার-রাস্তা। রাস্তাটার দক্ষিণ দিকে ভাঙাচোরা বস্তি আর উত্তরে একটা খাঁড়ি। খাঁড়িটা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) উপর দিয়ে গিয়ে চাঁদপাল ঘাটে পড়েছিল। বড় বড় নৌকো চলাচল করত এই খাঁড়িতে। এটি পরে বুজিয়ে ফেলা হয়। খাঁড়িটা নেই, তার রাস্তার নামে হয়েছে ক্রীক রো। ক্রীক কথাটার মানে খাঁড়ি। এই খাঁড়িতে নাকি একবার নৌকাডুবি হয়েছিল। তাই ক্রীক রো-র এককালে নাম ছিল ডিঙাভাঙা।

ধর্মতলার রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ ছিল। তাতে পথিক দাবদাহের হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেত। আর রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি ছিল বলেই এককালে তার পরিচয় ছিল 'অ্যাভিনিউ' বলে।

ধর্মতলা নাম কেন হল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে

মতভেদ আছে। কুক কোম্পানির আস্তাবল যেখানে ছিল সেখানে এককালে স্থাপিত হয়েছিল একটি বড় মসজেদ। এককালে এখানে কারবালার জমায়েত হত মহরমের সময়। এই মসজেদটি এখন আর নেই। এখন কারবালার জমায়েত হয় সার্কুলার রোডে। কটন সাহেবের মতে এই মসজেদটি থেকেই নাকি রাস্তাটির নাম ধর্মতলা।

ধর্মতলায় অবশ্য এখনও একটি মসজেদ আছে। ১৮৪২ সালে টিপু সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদ এই মসজেদটি তৈরি করান।

ড. হোয়েৰ্নেল কিন্তু মনে করেন জানবাজারে যে বুদ্ধমন্দির ছিল তা থেকেই এলাকাটির নাম ধর্মতলা। তাঁর এই মতের সপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। প্রথমত কোনো মসজেদকে কখনও ধর্মস্থান বলে মনে করা হয় না, শুধু মসজেদ বলেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মসজেদটি এবং তার উল্টো দিকের গীর্জাটি তৈরি হবার ঢের আগে থেকেই এলাকাটি ধর্মতলা বলে পরিচিত ছিল। আমরা জানি মেয়ো হাসপাতালটি ১৭৯৮ সাল থেকেই "খোলামেলা ধর্মতলা" এলাকায় অবস্থিত ছিল। অনেক পরে হাসপাতালটি জোড়া-বাগান এলাকার স্ট্র্যাণ্ড রোডে স্থানান্তরিত হয়।

১৮১৭ সালের তৎকালীন গভর্নমেণ্ট কলকাতা শহর উন্নয়নের জন্য একটি লটারি কমিটি নিয়োগ করে। ১৮২১ সালে এই লটারি কমিটির সম্পাদক গভর্নমেণ্টের কাছে যে চিঠি লেখেন তাতেও ধর্মতলার উল্লেখ আছে।

তবে হোয়েরর্নেলের তথ্যে একটা ভুল আছে। জানবাজারে যে মন্দিরটির কথা তিনি বলেছেন তা বুদ্ধমন্দির নয়, ধর্মরাজের মন্দির, যদিও হয়তো তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর একটা দূরাগত যোগ আছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মরাজের পুজো করে থাকেন। এই ধর্মরাজের মন্দির থেকেই সম্ভবত এলাকাটির নাম ধর্মতলা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে বাঁকারায় স্ট্রিট নামে একটি রাস্তা আছে। বাঁকারায় ধর্মরাজেরই নামান্তর। এ থেকেও মনে হয় ধর্মতলা নাম সম্পর্কে হোয়েরর্নেলের মতই সঠিক।

আঠেরো শতকের শেষের দিকেই ধর্মতলা হয়ে উঠেছিল একটি বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র। ধর্মতলা আর চৌরঙ্গীর সংযোগ স্থলে একটা বেশ বড়ো বাজার ছিল। ১৭৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাজারটির নাম ছিল শেকসপীয়রের বাজার।

১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হগ সাহেবের বাজার। এই নতুন বাজার শেকসপীয়র বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছিল না। তাই সাত লক্ষ টাকা মূল্যে এই বাজারটি কিনে নিয়ে তা তুলে দেওয়া হয়। ধর্মতলা স্ট্রিটের অন্য বাজার চাঁদনী চক বাজারটিও বহু পুরনো।

উনিশ শতকে ধর্মতলার এত গুরুত্ব ছিল না। তখনকার দিনেও কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ ছিল বৌবাজার। ধর্মতলা অঞ্চলের উন্নয়ন হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। এবং ক্রমে ক্রমে তা বর্তমান গুরুত্ব অর্জন করে।

উনিশ শতকের বর্ণনা থেকে জানা যায় ধর্মতলার দক্ষিণ

পার্শ্বে ছিল অতি জীর্ণ এক-সারি পর্ণকুটির। রাস্তার দু পাশেই ছিল গাছের সারি। এই এলাকার জমির মালিক ছিল জাফর নামে ওয়ারেন হেস্টিংসের এক জমাদার। রাস্তার উত্তর দিকে ছিল অসংখ্য ঘোড়ার আস্তাবল।

বাঙলার নবজাগৃতির অন্যতম পুরোধা হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও যে ডেভিড ড্রামণ্ডের স্কুলে পড়েছিলেন তা অবস্থিত ছিল এই ধর্মতলায়। ডিরোজিও নিজেও কাছাকাছি থাকতেন।

কলকাতার অনেক রাস্তার নামের সঙ্গেই এমনিধারা অনেক অতীত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই সব নাম ধরেই কলকাতার আদিপর্বে প্রবেশ ও উঁকি মারা সম্ভব। সুখের বিষয় সব রাস্তার উপর পৌরপিতাদের নেকনজর এখনও পড়েনি, ইতিহাসের অভিজ্ঞানগুলিও সব হারিয়ে যায়নি।

যেমন ধরা যাক তিরেট্টা বাজার এলাকার ওয়েস্টন লেন রাস্তাটা। ১৭৪০ সালে এই অঞ্চলে সি. ওয়েস্টন নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। তিরেট্টা বাজারের উল্টো দিকে ভদ্রলোকের বিরাট বাড়ি ছিল। বাড়ির চারপাশে ছিল সবুজের সমারোহ। ভদ্রলোক খুবই দানশীল ছিলেন। প্রতিমাসে তিনি ১৬০০ টাকা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতেন। দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য মৃত্যুকালে তিনি একলক্ষ টাকার এক তহবিল রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর পরহিতব্রতের কথা স্মরণ করেই সম্ভবত তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল রাস্তাটা। পৌর-পিতাদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে কী করে যে টিকে আছে রাস্তার

নামটা সেটাই আশ্চর্য ! ভদ্রলোকের পুণ্যের জোর আছে বলতে হবে।

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট রাস্তাটা এখনও আছে। ১৭২৭ সালে ইংরেজরা তাদের প্রথম আদালত স্থাপন করেছিল এই রাস্তায় অবস্থিত একটি বাড়িতে। পরে এখান থেকে আদালতটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়িটিও নেই। রাস্তাটা কিন্তু আড়াইশো বছরের অধিককাল ধরে সেই আদালতের স্মৃতি বহন করে টিকে আছে।

১৭৫৭ সালে লালবাজার আর চিৎপুর রোডের মোড়ে একটি জেল বা কারাগৃহ ছিল। চন্দননগর দখলের পর ফরাসী বন্দীদের এই জেলে আটক রাখা হয়। ১৭৫৹ সালের ১৮ ডিসেম্বর বন্দীরা দেয়ালের নিচে সুড়ঙ্গ কেটে পালিয়ে যায়। এই কাবাগারের সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রকাশ্য ফাঁসির স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এখন যেখানে সেণ্ট জন্‌স ক্যাথিড্রেল এককালে সেটা ছিল কবরস্থান। যোব চার্নকের সমাধি এইখানেই। ১৬৯৮ সাল থেকে প্রায় ১২০০০ লোককে এখানে কবর দেওয়া হয়। ১৭৬৬ সালে এক আদেশ-বলে এই স্থানটিকে কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়। পরে এই স্থানটিতেই সেণ্ট জনস্‌ গীর্জা নির্মিত হয়।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটটি এখনও আছে। এখানে এককালে সত্যিই কাউন্সিল হাউস অবস্থিত ছিল। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে পুরনো কাউন্সিল হাউসটি ভেঙে ফেলা হয়।

ক্লাইভ স্ট্রিট, এখন যার নাম হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড তার সংলগ্ন একটি রাস্তা ছিল যার নাম ছিল হামাম লেন। এই রাস্তার একটি বাড়িতে উষ্ণ জলের স্নানাগার সত্যিই ছিল।

থিয়েটার রোডের নাম এখন হয়েছে শেকসপীয়র সরণি। এই থিয়েটার রোড ছাড়াও কলকাতায় আর একটা থিয়েটার রোড ছিল। এটি ছিল বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে। লিয়ন্স রেঞ্জ-এর মোড়ে একটি থিয়েটার এবং নাচঘর ছিল। রাস্তাটির নাম হয়েছিল ঐ থিয়েটার থেকে।

হালসীবাগান নামে যে অঞ্চলটা এখন পরিচিত সেখানে ছিল উমিচাঁদের বাগান। ১৭৫৭ সালে সিরাজ উদ্-দৌলা এখানে তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মধ্যরাত্রে অতর্কিত আক্রমণ করে ক্লাইভ সিরাজ উদ্-দৌলা এবং তাঁর বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে সমর্থ হন।

উমিচাঁদ-জগৎশেঠ-মীরজাফরের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে। কিন্তু সেকালে উমিচাঁদের যেমন ছিল বিত্ত তেমনি প্রতিপত্তি। ইংরেজদের সঙ্গে কারবার করে তিনি কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন। হালসী-বাগানে তিনি রাজকীয় স্টাইলে বাস করতেন। কলকাতার অধিকাংশ ভালো ভালো বাড়িই ছিল তাঁর।

মারাঠা ডিচের এখন আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। এটা কাটা হয়েছিল ১৭৪২ সালে। ১৭৪০ সালে মারাঠারা বাংলাদেশ আক্রমণ করে। বালেশ্বর থেকে রাজমহল পর্যন্ত অঞ্চলে তারা

লুঠতরাজ করে এবং হুগলী দখল করে নেয়। ফলে অনেক শরণার্থী এসে কলকাতায় আশ্রয় নেয়। ইংরেজরা তখন সুতানুটি থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত কোম্পানির জমি একটি পরিখা কেটে নিরাপদ করার পরিকল্পনা নেয়। চিৎপুর ব্রীজ থেকে খালকাটা শুরু হয়। পরে সারা কলকাতা বেষ্টন করে পরিখা কাটার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় কাজ আর এগোয় না। ওয়েলেসলির আমলে সার্কুলার রোডের পাশে "চওড়া এবং গভীর" মারাঠা ডিচ ক্রমশ শহরের ময়লা ফেলে ভরাট করা হতে থাকে। খালের স্থান নেয় চওড়া সুন্দর রাস্তা। এককালে তা হয়ে ওঠে বেড়াবার জায়গা। এখন তা জনাকীর্ণ অতি-ব্যস্ত রাজপথ।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এখন নাম হয়েছে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। ১৮২২ সালে লটারি কমিটির উদ্যোগে এই অঞ্চলটির সংস্কার করা হয় এবং একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়। পুকুরটি অনেক দিন বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে এখনও পার্কের গোলতলাও নামটি ঘোঁচে নি। সম্প্রতি অবশ্য এখানে মাটির নিচে একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। ভূগর্ভে জলাধার আগেও একটা ছিল, এখন তা সংস্কার করে বড় করা হয়েছে। গোল না হোক, তলাওটি এখনও আছে। কাজেই লোকমুখে প্রচলিত নামটি এখনও সার্থক।

কলকাতার রাস্তাঘাট, অঞ্চলের নামের সঙ্গে এমনি করে অতীত দিনের অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সেই সব

উপাদান এবং উপকরণ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসছে এবং আসবে। তাদের নেতাদের নামে রাস্তা না হলে ইতিহাসে তারা স্থায়ী আসন লাভ করবে কী ভাবে। অতএব রাস্তাঘাটের নাম বদলানো হবেই। এদিকে আর মাত্র দশ বছর পরেই কলকাতার তিনশ বছর পূর্ণ হবে। কাজেই এখন থেকেই এই সব উপকরণ কাজে লাগিয়ে কলকাতার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় হাত দেওয়া উচিত।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'

প্রবাদটা আমরা প্রায় সকলেই জানি এবং সুযোগ পেলে ব্যবহার করতেও কসুর করি না। কিন্তু কে এই গৌরী সেন? সত্যিই কি গৌরী সেন নামে কেউ ছিলেন? এবং সত্যিই কি, তাঁর এত টাকা ছিল যে লাগলেই তিনি তা দিতে পারতেন?

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে এই গৌরী সেনের সামান্য কিছু পরিচয় আছে। শ্রীদাসের বিবরণ থেকে জানতে পারি, গৌরী সেন "কোম্পানীর আমলে বহরমপুর নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কলিকাতা আহিরীটোলায় ইহার ভদ্রাসন এখনও বিদ্যমান আছে। দেনার দায়ে যাহারা জেলে যাইত এবং অর্থাভাবে যাহাদের উদ্ধারের আর উপায় থাকিত না তাহাদিগকে গৌরী সেন নিজের টাকায় ঋণমুক্ত করিয়া দিতেন। দাতাকর্ণের ন্যায় তাঁহারও নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।"

অভিধানকারের এই বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু এরই মধ্যে থেকে তিনটি তথ্য জানা গেল। প্রথমত, কোম্পানির আমলে গৌরী সেন নামে একজন ধনাঢ্য ব্যাক্ত সত্যিই ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর নিবাস ছিল বহরমপুর, এবং ভদ্রাসন ছিল কলকাতার অহিরীটোলায়, এখনও সে ভদ্রাসন আছে কিনা তা অবশ্য জানা নেই। এবং তৃতীয়ত, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অন্তত কিছু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছিলেন।

গৌরী সেনের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় পাদ্রী লঙ সাহেবকে লেখা জনৈক দেশীয় বন্ধুর একটি পত্রে। এই লঙ সাহেবই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের ইংরেজি তরজমা প্রকাশ করেছিলেন। এই 'অপরাধে' তাঁকে সাধারণ কয়েদীর মতো কারাবাস করতে হয়েছিল। তাছাড়া জরিমানা দিতে হয়েছিল এক হাজার টাকা। কিন্তু সে-অন্য প্রসঙ্গ।

লঙ সাহেব ১৮৫০ সালে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় সেকালের সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি ঐ দেশীয় পত্রটি ব্যবহার করেন। গৌরী সেন কী করে বিপুল বৈভবের মালিক হলেন এই চিঠিতে আর আভাস পাওয়া যায়। গৌরী সেন ছাড়া অন্য প্রসঙ্গও চিঠিতে আছে। তা সত্ত্বেও চিঠিটা পুরোই এখানে উদ্ধৃত করলাম।

"কলকাতার প্রাচীনতম বাসিন্দাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠ। প্রায় একশ বছর আগে তিনি বড়বাজার অঞ্চলে বাস করতেন। তিনি সেকালের সবচেয়ে ধনী এবং সৎ ব্যবসায়ীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সততার

একটা উদাহরণ হিসেবে বলা হত, তাঁর শীলমোহরে প্রেরিত গঙ্গাজল ছাড়া অন্য কোনো জল তেলেঙ্গানার রাজকুমার রামরাজা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতেন না।

"একবার শেঠ তাঁর অংশীদার গৌরী সেনের নামে কিছু দস্তা কিনলেন। সেই দস্তায় দেখা গেল প্রচুর রুপো মেশানো আছে। তিনি (শেঠ) ভাবলেন তাঁর অংশীদারের ভাগ্যেই ধাতুর রূপান্তর ঘটেছে, এবং, তদনুসারে অন্য লোকের সৌভাগ্যের ভাগীদার হতে অনিচ্ছুক হয়ে সমস্ত লাভটাই তিনি তাঁকে (গৌরী সেনকে) দিয়ে দিলেন। এইভাবে ছাপার ফুঁড়ে ধনলাভ করায় গৌরী সেন খুবই ধনী হয়ে গেলেন। ঋণের দায়ে কেউ কারারুদ্ধ হলে তার মুক্তির জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন কিংবা কোনো গরীব ব্যক্তি যদি কোনো ভালো কাজের জন্য লড়াই করত এবং তার ফলে তার জরিমানা হত তাহলে সে জরিমানার টাকা তিনি দিয়ে দিতেন: এ থেকেই প্রবাদ সৃষ্টি হল, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।'

"এই শেঠ সম্পর্কে গল্প আছে, একবার তিনি নাকি বর্ধমানের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০,০০০ মণ চিনি কেনার চুক্তি করেছিলেন। এই ব্যবসায়ীর নাম ছিল গোবর্ধন রক্ষিত, জাতিতে তাম্বুলী বা পান ব্যবসায়ী। যখন বড়বাজারে কদমতলা ঘাটে চিনির নৌকা এলো তখন শেঠের লোকেরা প্রেরকের কাছ থেকে টাকা আদায়ের মতলবে বলল মালের ওজন কম আছে। যথাসময়ে প্রেরককে তা জানান হল এবং অনুরোধ করা হল ঐ অনুপাতে যেন দাম কমিয়ে দেওয়া হয়।

দাম কমিয়ে অসাধুতার অপবাদ মেনে নেওয়ার চেয়ে রক্ষিত আদেশ দিলেন সমস্ত মালটা যেন নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর আদেশ যখন অংশত প্রতিপালিত হয়েছে, তখন শেঠ বাধা দিয়ে জানালেন বাকী মালটা তিনি নিয়ে নেবেন কিন্তু দাম দেবেন পুরো মালটার। কিন্তু সাধুতার প্রতি-যোগিতায় শেঠের কাছে হার মানতে রাজী নন গোবর্ধন, চুক্তি অনুসারে বাকী মালটার যে দাম হয় সেই দামই শুধু নিতে রাজী হলেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি ঘটল।

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমীর চাঁদের দাড়ি।
হুজুরি মল্লের কড়ি।

"উপরের পংক্তি কটিতে যে চারজনের নাম করা হয়েছে তারা বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক, সকলেই সমসাময়িক। এর মধ্যে বাড়ির জন্য বিখ্যাত বনমালী সরকার জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। ইওরোপীয় বণিকদের বেনিয়ন হিসেবে তিনি কাজ করতেন। বাগবাজারের সন্নিকটে তাঁর বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। তাঁর পুত্র রাধাকৃষ্ণ সরকারের হিন্দু সমাজে বেশ উচ্চ আসন ছিল, এমনকি রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর সুদিনেও তাঁকে নাকি তোয়াজ করে চলতেন।

"গোবিন্দরাম মিত্র ছিলেন জমিদার। মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছ থেকে তিনি বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

মুগুরের আইনের প্রতি আসক্তির জন্য তিনি কুখ্যাত ছিলেন এবং তাঁর লাঠি সকলের ভীতির কারণ ছিল। চিৎপুর রোডে তাঁর একটি মন্দির (কলকাতার প্রাচীনতম) এবং নবরত্ন এখনও আছে।

"হুজুরিমল ছিলেন এক শিখ ব্যবসায়ী। বড়বাজারে এক বিরাট বাড়িতে থাকতেন। 'অকাল'-এর গুণকীর্তনের জন্য তার ষোলো দল গীতিকার ছিল। বৈঠকখানা অঞ্চলে তার নামে একটি রাস্তা আছে।

"দেওয়ান কাশীনাথ ছিলেন ভূঁইফোড় লোক। তাঁর বিধবা মা শাহ্ জুম্মা নামে এক মুসলমান ফকিরের সেবা করতেন। বড়-বাজারে নদীর ধারে এক নলখাগড়ার ঝোপে ফকির থাকতেন। কথিত আছে ফকিরের মৃত্যুর পর তাঁর আশীর্বাদে কাশীনাথ কিছু ধনসম্পদ লাভ করেন। কাশীজোরার রাজার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর আরও শ্রীবৃদ্ধি হয় আর এই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠ।"

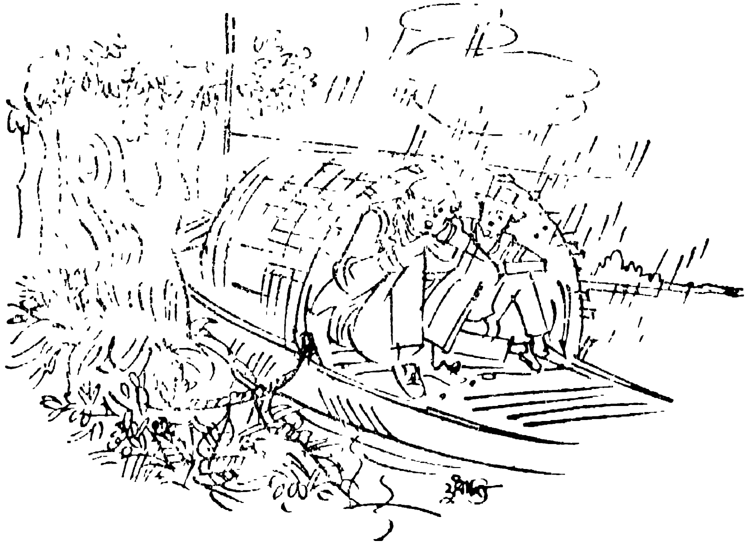
চিঠিটা এইখানে শেষ। কিন্তু সেকালের কলকাতার গল্পের শেষ নয় এবং সে-গল্পের শেষ নেই। আর এ-সবই সত্যি এবং তাহলেও গল্প।

কলকাতার নামরহস্য

শহর কলকাতা এমন কিছু প্রাচীন শহর নয়, তবু দেখতে দেখতে তারও বয়েস প্রায় তিনশ বছর হতে চলল। আমি শহর কলকাতার কথাই বলছি, ঐ নামে যে একটি গ্রাম ছিল তার কথা নয়। আর শহর কলকাতার বয়েসের হিসাব আমি করছি বারবার তিনবার এসে শেষ পর্যন্ত যোব চার্নক যেদিন (২৪ অগস্ট, ১৬৯০) সুতানুটিতে থিতু হয়ে বসলেন সেই দিন থেকে।

এসব কথা আগেভাগেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো, অন্যথায় যা আমি বলতে চাই নি, তা নিয়েই হয়তো তর্ক বেধে যাবে।

দিল্লি কি মস্কোর মতো প্রাচীন না হলেও, তিনশ বছর বয়েসটাও কিছু কম নয়। এই তিনশ বছরে কলকাতার অতীত ইতিহাস নিয়ে চর্চাও কিছু কিছু হয়েছে। বিশেষ করে গত একশ বছরে। ইতিহাসের অনেক অন্ধকার দিক এখন



আলোকিত, অনেক বিতর্কিত প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়েছে, শেষ দেখা যাচ্ছে না শুধু একটি তর্কের, কলকাতা নামটা এলো কি করে ?

আজ থেকে আশী বছর আগে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত[১] নামে জনৈক ভদ্রলোক কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে দশটি মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি লিখেছিলেন, "শহরের নাম 'কলিকাতা' বা কালকাট্টা কিরূপে হইল ইহা লইয়া অনেক মত ও প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা—(১) কিলকিলা নগরী (২) কোলখাতা (৩) কোলকাতা (৪) যক্ষপুরী (৫) গলগাটা (৬) কালকাটা (৭) খালকাটা (৮) কালীঘাটা (৯) কালীকোটা (১০) আলানগর।"

এই তালিকা থেকে তুটি অর্থাৎ যক্ষপুরী এবং আলীনগর বাদ দেওয়া যেতে পারে। যক্ষপুরী কালক্রমে বিকৃত হয়ে কলকাতা হয়েছে, এটা নিতান্ত কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। আর আলীনগর তো কলকাতার চেয়েও অর্বাচীন। সিরাজ-উদ্-দৌলা কলকাতা জয় করে তার নাম পালটে রেখেছিলেন আলীনগর। কিন্তু সে-নাম বেশীদিন চলে নি। পলাশী যুদ্ধের পরই ইংরেজরা সে নাম বাতিল করে আবার কলকাতা নাম প্রবর্তন করে। সম্ভবত আলিপুরের মধ্যে আলীনগরের স্মৃতি কিছুটা বেঁচে আছে। কিন্তু এ-নিয়েও মতভেদ আছে। পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর আলি খাঁ নাকি এ-অঞ্চলে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তাঁরই নামে আলিপুর।

এই তালিকা থেকে যেমন তুটি মত বাদ যাবে, তেমনি যোগ হবে একটি মতের, সে মত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। সুনীতিকুমারের মতে কলিচূনের কাতা থেকে কলিকাতা। বিনয় ঘোষ এ-মতের সমর্থক ছিলেন।

কিছুকাল আগে শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয় সুনীতি কুমারের মতকে একেবারে নস্যাৎ করে ছেড়েছেন। সম্প্রতি তাঁর এই লেখাটি তাঁর 'কলিকাতা-দর্পণ' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রীমিত্র সুনীতিকুমারের মত খণ্ডন করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে কলকাতা নামের উৎপত্তি হল কিভাবে তা খোলসা করে বলেন নি। তাই শ্রীমিত্রের মত এখনও আমাদের অজানা। অতএব তা আলোচনার বাইরে।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় যে দশটি "মত এবং প্রবাদের" উল্লেখ করেছেন, প্রথমেই তার থেকে দুটি আমরা বাতিল করে দিয়েছি এবং যোগ করেছি একটি। এখন এই নয়টি "মত এবং প্রবাদ" কি এবং তার কতটা ধোপে টেকে তার একটু হিসেব নেওয়া যাক।

দত্ত মহাশয়কে অনুসরণ করে প্রথমে 'কিলকিলার' কথাই ধরা যাক। তিনি লিখেছেন, "কোন কোন বিজ্ঞ প্রাচীন অধিবাসীর বিশ্বাস দিগ্বিজয়প্রকাশ গ্রন্থে যে কিলকিলা নগরীর উল্লেখ আছে, তাহারই অপভ্রংশে কলিকাতার নাম প্রচলিত হইয়াছে।" এই বিজ্ঞ প্রাচীন অধিবাসী সম্ভবত রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।[২]

শ্রী এ কে রায় তার 'শর্ট হিস্ট্রি অব ক্যালকাটা'তে লিখেছেন, "কিলকিলা প্রদেশ একুশ যোজন (১৬০ বর্গ মাইল) বিস্তৃত ছিল, সরস্বতী প্রবাহিত তার পশ্চিমে এবং যমুনা পুবে, হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, খড়দহ, শিয়ালদহ, গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রাম এর অন্তর্গত ছিল।"[৩] ঐতিহাসিক মহলে এ-ব্যাখ্যা খুব একটা গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। অতএব এনিয়ে অযথা বাগ-বিস্তারের প্রয়োজন নেই।

কোলকাতা থেকে কলকাতা এরকম একটি ইঙ্গিত আছে বাবু গৌরদাস বসাকের একটি রচনায়। তিনি বলেছেন, কোলি কা হাতা বা কোল কা হাতা থেকে কালক্রমে কলকাতা হতে পারে। হাতা মানে বসতি। আদি যুগে হয়তো এখানে

'কোল' বা কোলিদের বসতি ছিল। তা থেকেই এই নাম। বাবু গৌরদাস বসাক কিন্তু বলেছেন এই তত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান শেষ হয় নি।[৪]

শ্রীরাধারমণ মিত্রের কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু পক্ষপাতিত্ব আছে দেখা যাচ্ছে। তিনি লেখেন, অবশ্য যথারীতি গৌরদাস বসাকের নাম উল্লেখ না করেই "কলিকাতাকে আমরা যেমন উচ্চারণ করি কোলিকাতা, কলকাতাকেও আমরা সেই রকম উচ্চারণ করি 'কোলকাতা।' এখন যে ব্যুৎপত্তির কথা বলছি সেই অনুসারে কোলিকাতা = কোলি কা হাতা এবং কোলকাতা = কোল কা হাতা। এর অর্থ 'কোলি' বা 'কোল' নামক জাতির গণ্ডি বা দেশ।" এ-প্রসঙ্গে শ্রীমিত্র মন্তব্য করেন, "আর একটি বুৎপত্তি আছে যেটি অন্য কোনো কারণে না হলেও নিছক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে চিত্তাকর্ষক এবং ভাষা-তাত্ত্বিকের সেটি খেয়াল রাখা উচিত।"[৫]

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় কিন্তু এই তত্ত্ব একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন: "কোল জাতি এই বন ও জলাভূমিতে এমন কি উপার্জনের পন্থা পাইবে যে, বংশ পরম্পরায় এখানে বাস করিয়া আপনাদিগের নামানুসারে স্থানের নামাকরণ করিবে? তাহাদের সমস্ত জাতি কি একেবারে অদৃশ্য হইল? বরং কোলকাতা কতকটা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কারণ দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কৈবর্ত জাতিরা বহুকাল হইতে বসবাস করিতেছে, তাহাদের কোন বংশ সুবিধা বুঝিয়া এখানে আগমণ করা অসম্ভব নহে।" কিন্তু দত্ত মহাশয় নিশ্চিত করে

কিছু বলা বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করেন নি। তিনি লিখেছেন, "এখন যে স্থানকে জেলেটোলা বলে তাহা ইহার তীরে (যে খালটি বুজিয়ে ক্রীক রো নামে রাস্তা হয়েছে —লেখক) এবং এই স্থানের মৎস্যজীবীরা অতি প্রাচীন অধিবাসী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কোলে উপাধিধারী ছিল কি না এবং তাহার নাম অনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে, ইহাও কেবল অনুমান মাত্র।"[৬]

কলকাতা এক সময় খুবই অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। হ্যামিলটন সাহেব তো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে সরাসরিই বলেছেন, কুঠি স্থাপনের জন্য চার্নক সাহেব বোধ হয় কলকাতার চেয়ে বেশী অস্বাস্থ্যকর আর কোনো জায়গা খুঁজে পেতেন না। হ্যামিলটন সাহেব লিখেছেন, এক বছর তিনি এখানে বাস করেছেন। তখন এখানে ইংরেজ বাসিন্দের সংখ্যা ছিল ১২০০-র মতো। এ হিসেব অগস্ট মাসের। জানুয়ারি শুরু হবার আগেই ক্লার্কের 'বুক অব মরটালিটি' অনুসারে কবর দেওয়া হয়েছিল ৪৬০ জনকে।[৭]

পাদ্রী লঙ সাহেব লিখেছেন, বর্ষাকালে নানারোগে ইওরোপীয়রা এখানে মাছির মতো মারা যেত। সেই কারণে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক, এই স্থানের নামকরণ করেছিলেন 'গলগোথা' (Golgotha)।[৮] কলকাতা এই গলগোথারই বিকৃত রূপ। এই তত্ত্ব নিতান্ত কষ্টকল্পিত, লঙ সাহেব সহ কোনো ঐতিহাসিকই একে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন নি। কাজেই এ নিয়েও অধিক বাক্য ব্যয় না করাই শ্রেয়।

দত্ত মহাশয়ের তালিকার ছ নম্বর তত্ত্বটি আরও হাস্যকর। এক ঘাস্তুড়িয়া নাকি ঘাস কেটে ডাঁই করে রেখেছিল। এক সদ্য আগত সাহেব নাকি তার ছড়ি গাছাটা সেই দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটা কোন জায়গা। ঘাস্তুড়িয়া ভাষা বোঝে না, সে ভাবল সাহেব বুঝি জিজ্ঞাসা করছে, ঘাস কবে কাটা হয়েছে। তাই সে জবাব দিল কাল কাটা। সাহেব ভাবল জায়গাটির নাম বুঝি কালকাটা। গল্পটি যে একেবারেই কাকতালীয় নিতান্ত অজ্ঞ লোকও তা সহজে বুঝতে পারবেন। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা কেউই গল্পটিকে গুরুত্ব দেন নি, কিন্তু তবু উল্লেখ করেছেন সকলেই।

দত্ত মহাশয়ের তালিকার আট এবং নয় নম্বর তত্ত্ব একই সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, কেননা মূলত দুটি তত্ত্বই এক। দেবী কালিকা থেকেই কলিকাতা বা কলকাতা নামের উৎপত্তি। অনেক মহা-মহারথী এই তত্ত্বের সমর্থক। স্বয়ং পাদ্রী লঙ লিখেছেন, ইওরোপে দেখা গেছে অনেক শহরের নামই হয়েছে কোনো মঠ বা দুর্গের অবস্থান থেকে। আগে হয়তো ওগুলো নির্মিত হয়েছে, পরে তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শহর। যেসব শব্দ শেষ হয়েছে 'চেস্টার' (কাসট্রা) দিয়ে তাতেই এর আভাস পাওয়া যায়। মধ্য যুগে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটেছে। পুরাকথা, বর্তমান আচার এবং পুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে গঙ্গার স্রোত নাকি একদা টালির নালার খাত ধরে বইতো আর কালীঘাট হল বঙ্গদেশের সবচেয়ে পবিত্রতম

মন্দিরগুলির একটি এবং প্রাচীনকাল থেকে এটি একটি পীঠস্থান বলে গণ্য। তাহলে কলকাতাকে কালীঘাটেরই অপভ্রংশ বলে ধরতে বাধা কি ?[৯]

পাদ্রী সাহেব প্রশ্নটা আমাদেরই উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মেরেছেন। কিছু সম্ভাব্য আপত্তিও নিজেই খণ্ডন করেছেন: যে সময় চার্নক সাহেব এসে সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন করেন তখন চৌরঙ্গীর সমতলভূমি ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ, চাঁদপাল ঘাটের কাছে ছিল কিছু তন্তুবায়ের কুটির। কালীঘাট ছাড়া ধারে কাছে আর কোন বিখ্যাত স্থান ছিল? ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রের নাম তো হয়েছিল নিকটবর্তী বৃহত্তম গ্রামের নাম থেকেই, যদিও হয়তো সাঁ জঁ হয়তো ছিল আরও কাছে।[১০]

লঙ সাহেব অবশ্য এই তত্ত্বকে নিছক একটা 'কনজেকচার' বা অনুমান বলেই থেমে গেছেন। কিন্তু বাঙালীরা একে কালী-ভক্ত, তদুপরি সাহেবের এবং যে-সে সাহেব নয় লঙ সাহেবের অনুমান। অতএব পাল্লা এদিকেই ভারী।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব এ-মত সমর্থন করেছেন। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়েরও ধারণা কালীঘাট থেকেই ধার করা হয়েছে শহর কলকাতার নাম। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের মনে যদিবা কিছু সংশয় আছে, প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয় তো কোনো সন্দেহের অবকাশই রাখেন নি। কালীঘাট, কালীক্ষেত্র, কালী-কোটা থেকেই যে কলকাতা হয়েছে এ-ব্যাপারে তিনি তো একেবারে স্থির নিশ্চিত।[১১]

কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছেন গৌরদাস বসাক মহাশয়। বিস্তৃত

আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, অতি সংক্ষেপে তাঁর কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করছি। অতিকথায় যাই বলা হোক, কালীঘাট এবং কলকাতার মধ্যে কোনটা প্রাচীন নিশ্চয় করে বলা শক্ত। গৌরদাস বলেছেন, কালীঘাটের উল্লেখ প্রথম কোথায় এবং কবে পাওয়া যায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের গুরুত্ব আরও বেশী এই কারণে যে এর সঙ্গে জড়িত আছে কলকাতা নগরীর পত্তনের ব্যাপার. অনেকের বিশ্বাস কালীঘাট থেকেই এসেছে কলকাতা নাম।

পুরাণের সাক্ষ্য কালীঘাটের প্রাচীনত্ব প্রমাণের সহায়ক নয়। কালিকা পুরাণে কালীঘাটের নাম নেই। দেবী ভাগবতে ১০৮টি পীঠস্থানের নাম আছে, নেই কালীঘাটের নাম। মহানির্বাণ তন্ত্রেও এই পীঠ উহ্য। তন্ত্র চূড়ামণিতে ৫১ পীঠের মধ্যে অবশ্য কালীপীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে গুহ্য কালী।

গৌরদাস বলছেন, ঐ সব গ্রন্থে কালীপীঠের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সঠিকভাবে জানা যায় না কবে প্রথম দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং তা হয়ে ওঠে হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

'আইন-ই-আকবরি'তে কালীঘাটের উল্লেখ নেই, যদিও ঐ অঞ্চলের অনেক তীর্থক্ষেত্রের নাম আছে। এতে অবশ্য প্রমাণ হয় না, ঐ সময়ে কালীঘাটের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করতে হয় যে, তা তখনও তীর্থক্ষেত্র হিসেবে ততটা পরিচিত হয়ে ওঠে নি।

আকবরের আমলে বাংলা-বিহারের সুবাদার ছিলেন মান

সিংহ। তিনি ছিলেন কালীভক্ত। যদিও তিনি আফগানদের ধাওয়া করে জাহানাবাদ এসেছিলেন এবং তা কালীঘাটের খুব নিকটে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কালীঘাটে পুজো দিয়েছিলেন বলে জানা নেই। মানসিংহ যশোহরেশ্বরী কালীর পুজো দিতে কিন্তু ভোলেননি। তাঁর কালীভক্তি এত প্রবল ছিল যে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার পর যশোহরেশ্বরীকে তিনি নিজ রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তীর্থক্ষেত্র হিসেবে কালীঘাটের মাহাত্ম্য যদি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হত তাহলে মান সিংহ নিশ্চয়ই সেখানে যেতেন।

'চৈতন্য চরিতামৃতে' চৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রার বিবরণ আছে। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে। চৈতন্যদেবের আমল বলতে বোঝায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। চৈতন্যদেব নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে বরাহনগর পর্যন্ত এসেছিলেন বলে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' উল্লেখ আছে; কিন্তু কালীঘাট দর্শনের কোনো সাক্ষ্য নেই। চৈতন্যদেব অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন এবং সে-কারণে শাক্ত তীর্থের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ থাকার কথা নয়। তবুও কালীঘাট যদি তখন অতি সুপরিচিত তীর্থ হত তাহলে, অন্তত শচীমাতার খাতিরেও হয়ত সে-তীর্থে একবার তিনি যেতেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অবশ্য কালীঘাট এবং কলিকাতা উভয়েরই উল্লেখ আছে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই পংক্তিটি প্রক্ষিপ্ত, পরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কালীঘাট কত প্রাচীন এবং তার মাহাত্ম্য কতটা, এ-নিবন্ধে

তা বিচার্য নয়। 'আইন-ই-আকবরি'র সাক্ষ্য থেকে বলা যায় কালীঘাটের নাম যখন ততটা পরিচিত নয় তখনও মহল হিসেবে কলকাতার অস্তিত্ব ছিল। (শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয় অবশ্য 'আইন-ই-আকবরি'র এই তরজমাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এই তরজমা মানেন।) কালীঘাটের বর্তমান মন্দির অবশ্য সাবর্ণ চৌধুরীরা অনেক পরে নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা যায়, কলকাতা বা কলিকাতা শব্দের ব্যুৎপত্তি আর যাই হোক তা কালীঘাট বা কালিকোটের অপভ্রংশ নয়।

গৌরদাস আরও বলেছেন, কোন হিন্দু, তা সে যতই অজ্ঞ-মূর্খ হোক, কখনই লেখায় তো নয়ই মুখেও, দেবী কালীকে 'কোল' বলে বিকৃত করবে না। তাই ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে, এবং হিন্দু ধর্মের দিক থেকেও বটে কালীঘাট থেকে কলিকাতা বা কলকাতা হওয়া অসম্ভব।[১]

খালকাটা থেকে কলকাতা—এ তত্ত্বটিকেও কেউ কোন গুরুত্ব দেয় নি, আমরাও দেব না। এ-প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট, বর্গীর হাঙ্গামার সময় মারাঠা খাল যখন কাটা হচ্ছিল তখন নাকি খালকাটা থেকে কালকাটা নামের উৎপত্তি হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কলকাতা নামের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সব কটি তত্ত্বই কেউ না কেউ নস্যাৎ করেছেন। তা সত্ত্বেও কলকাতা আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলেই মনে

হয়। কলি চূণের কাতা থেকেই কলিকাতা হোক, আর কালীঘাটের বিকৃতিই কলকাতা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না—কলকাতা কলকাতাই এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।